আরতি

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ

নববিধান ট্রাষ্ট
কলিকাতা

১৩৩৯ সাল।

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা
৩১নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণ

আরতির দ্বিতীয় সংস্করণের সত্ত্বাধিকার (৫০০ কপি) নববিধান ট্রাষ্টকে দান করিলাম।

শ্রীশকুন্তলা সেন
২৬।৪।৩২

এই দানের জন্য নববিধান ট্রাষ্ট উঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন
নববিধান ট্রাষ্ট সম্পাদক
২৩।৫।৩২

প্রকাশকের নিবেদন

দাদা চলিয়া গিয়াছেন,—বিশ্ব-দেবতাই এই অযোগ্য হস্তে একটী কাজের ভার দিয়াছেন,—সেটী তাঁর হৃদয়ের ছন্দে স্পন্দিত, বিশ্বাস-ভক্তিতে প্রাণময়, অনুপ্রাণনায় মর্ম্মস্পর্শী, প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল, তাঁর গভীর চিন্তা ও ধর্ম্মভাবপ্রসূত মধুর উপদেশ ও বক্তৃতা—যাহা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন ও উচ্চভাব ও অনুপ্রাণনা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, এবং যাহার শক্তি ও মাধুর্য্য, মনে হয়, এখনও পাঠকদিগের মনে সেরূপ ভাব উদ্দীপিত করিবে; তার যে কয়েকটী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সাধারণের সম্পদরূপে রক্ষিত করা। যিনি ভার দেন, তিনিই শক্তি ও সুবিধা দিবেন—ইহাই একমাত্র আশা ও ভরসা। তাঁর প্রসাদে এই কয়েকটী উপদেশ ও বক্তৃতা বাহির করিতে পারিলাম বলিয়া তাঁরই চরণে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করি।

স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিনয়েন্দ্রকে দেখিলে তাহাকে একটী সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই মনে হয়। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ যেমন পণ্ডিত ও তার্কিক ছিলেন, এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা সমুদয় কূট তর্কজাল ছেদন করিতেন, তেমনিই চরিত্রের সহজ সৌন্দর্য্য-বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ দাদার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যখন মনে করি, তখন মনে হয় আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাধু-হৃদয়ের সরল, ব্যাকুল প্রার্থনা আমাদের একজনের জীবনেও সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে। আমাদের পিতৃদেব আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে

সর্ব্বদা একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুবিকশিত গোলাপের সঙ্গে তুলিত করিতেন এবং আকুল প্রার্থনায় তাঁর সন্তানদের জীবন যাহাতে সেই আদর্শে গঠিত হয়, তাহাই নিবেদন করিতেন। বিনয়েন্দ্রনাথের জীবন পূর্ণতার আনন্দময়, সৌন্দর্য্যময় অভিব্যক্তিতে সহজ সরল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি চিরদিন সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন ;—সৌন্দর্য্যে পূর্ণতার আত্মপ্রতিষ্ঠা—পুণ্যের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ।

সত্যং শিবং সুন্দরং—সত্যং—in all and above all—এক, সর্ব্ব ও সর্ব্বাতীত ; শিবং—সর্ব্বগত ও সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল, বিচিত্র রূপধারী ও ঘটে ঘটে বিরাজমান ; সুন্দরং—বহুর বিচিত্র সমবায়ে একের আত্মপ্রতিষ্ঠা, শিবমেব আনন্দময়, সৌন্দর্য্যময় জয়-স্বরূপ। সুন্দর—সত্য শিবের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা,—আনন্দের মূর্ত্তি—এই সুন্দরই তাঁর উপাস্য। চির-সুন্দর তাঁর চক্ষুকে অপূর্ব্ব অপার্থিব আলোকে রঞ্জিত করিয়া, প্রাণকে আলোকের ধারায় স্নাত করিয়া দিয়া, তার সম্মুখে আপনার তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য্যলহরী নবজলধরের অপূর্ব্ব সমাবেশে, তমিস্রা রজনীর অনন্তবিসর্পী নক্ষত্র-খচিত কবরী ও অঞ্চলে চির আবৃত রহস্যময় মুখচ্ছবিতে, উষার আলোকচ্ছটায় ও সন্ধ্যার আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব চির-রহস্য-মণ্ডিত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে চন্দ্রকিরণ-বিচ্ছুরিত নদীর নর্ত্তন-ভঙ্গিতে, ফুলের আনন্দময় অরূপ ও অপরূপ সৌন্দর্য্য রচনায় সাধুজীবনের চরিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে প্রবাহিত করিয়া, তারই স্রোতে কোন্ আনন্দময় লোকে তাঁকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত ও আনন্দময়ের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিরূপে তাঁর জীবনকে ফুটাইয়া তুলিত।

তাঁর জীবন বাল্যকাল হইতেই কয়েকটী বিশেষ চিহ্নে পরিচিহ্নিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ, তাঁর সলজ্জ প্রেম ভালবাসার আরক্তিম প্রকাশ,—সুসংযত উচ্ছ্বাস ও সুমার্জ্জিত ব্যবহার, এবং আত্ম-গোপন-প্রয়াসী প্রতিভার উজ্জ্বল

বিকাশ। এই সকল তাঁর মুখে ও ভঙ্গিতে এক অব্যক্ত গাম্ভীর্য্য আনিয়াছিল, জীবন ও চরিত্রকে এক নিঃশব্দ স্থির গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁর নিকট গেলে বয়োবৃদ্ধদের মনেও তাঁর প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধি জাগিয়া উঠিত। তাঁর কোন অতিশয় ভক্তিভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক-স্থানীয় নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় বলিয়াছিলেন,—আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট পরাজিত হই নাই; কিন্তু বিনয়েন্দ্রের মধুর হাস্যময় মৌন স্থিরতার নিকট আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাচাল, অধ্যাপকদের নিগ্রহকারী কোন দুর্ব্বৃত্ত ছেলেকেও বলিতে শুনিয়াছি,—বিনয়েন্দ্র বাবু ক্লাসে গেলেই যেন চঞ্চল হৃদয় আপনি শান্ত হইয়া আসে, সমুদয় শ্রেণীর শত কণ্ঠের কোলাহল একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়, সমুদয় দুষ্টবুদ্ধি লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে উঠে, আর তাঁর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় অন্ধকার হৃদয়েও এক মধুর আলোক খেলিয়া বেড়ায়, তখন আর তাঁর কথা না শুনে থাকতে পারা যায় না।

বিনয়েন্দ্রনাথের জীবনে তিনটী আদর্শ অপরূপ সামঞ্জস্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন আদর্শ যদি জীবনের একত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে তবেই তাহাদের জৈবিক ও আত্মিক একত্ব সূচিত হয়। ভারতীয় অতি-প্রাকৃত আত্মিক ও জীবনের গভীরতা লইয়া গ্রীসের প্রাকৃত জীবনের পূর্ণতার আদর্শ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এবং এই পূর্ণতর জীবন খ্রীষ্টীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পবিত্রাত্মার অগ্নিময় সংস্পর্শে ও প্রভাবে ও ভগবৎ ইচ্ছায় আত্মোৎসর্গে (self-consecration) স্বর্গের ছবি প্রদর্শন করে ও ঐশীশক্তি ও প্রভাবে পূর্ণ হইয়া চারিদিকে স্বর্গের প্রভাব বিস্তার করে। ক্রুশবাহী ও ক্রুশোপরিশায়িত পবিত্রতা ও আত্মোৎসর্গের মূর্ত্তি—যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার জীবন-মন্ত্রে দিক্ষীত শিষ্যবর্গ এবং ভগবৎ-প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ—যাঁর প্রেমোন্মত্ত জীবনে

লীলাময় শ্রীহরির নিত্য বৃন্দাবন লীলা অভিনীত ও হৃদয়ে ভগবৎপ্রাণের অশ্রুতপূর্ব্ব নৃত্য ও কীর্ত্তন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যাঁর প্রেমরাগে অনুরঞ্জিত চক্ষু ও প্রাণের নিকট গঙ্গা যমুনারূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল, নীল সমুদ্রের শুভ্রফেন-শোভিত তরঙ্গরাজিতে চন্দ্র-কিরণের অপরূপ নৃত্য-লীলা প্রেমময়ের লীলা-ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল—সেই শ্রীচৈতন্যদেব —এই দুই দেব-চরিত্র তাঁর জীবনকে শুদ্ধ, পবিত্র ও মধুময় করিয়াছিল।

পৃথিবীর ঘটনারাজি ও মানবজাতির অভিব্যক্তির ইতিহাস, দার্শনিকদিগের দর্শন ও চিন্তার ধারা ও প্রণালী, সাহিত্যিকদিগের অপরূপ রস বৈচিত্রের সৃষ্টি ও ভাব ও চিন্তা কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারিত না, যতক্ষণ তিনি তাহাদের পশ্চাতে জীবন ও চরিত্রের পরিচয় না পাইতেন ও জীবন ও চরিত্র গঠনের শক্তির উপলব্ধি করিতে না পারিতেন। ইহা এক নূতন Pragmatism। জীবনের ভাষাতেই তিনি ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, সমাজ, সমাজ গঠন, সমাজ তত্ত্ব, সমুদয় ব্যাখ্যা করিতেন। জীবনের, পূর্ণ জীবনের অভিব্যক্তি ও বিচিত্রতা, এবং বিচিত্রতার অপরূপ সামঞ্জস্য জীবন ও চরিত্রে উপলব্ধি করিয়া তাহারই আলোকে ঘটনারাজির অর্থ ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতেন। তাঁহাতে একদিকে কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দার্শনিকের সমগ্র দৃষ্টি ছিল ও অন্যদিকে ঐতিহাসিকের বাস্তবিকতা ছিল। এই সকলের মধ্যে প্রেম ও ভক্তিপ্রবণ সুকোমল হৃদয়খানি ঢালিয়া দিতেন। তিনি গীতার উপর যে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেন তাহারাই এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকলেব সমাবেশে তার বক্তৃতা ও উপদেশ জীবনের শক্তি ও প্রভাব লইয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে স্পর্শ করিত, প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জীবনে সাড়া লাভ করিত, চিন্তাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নূতন আলোক রাজ্যে লইয়া যাইত এবং এক বিচিত্র মাধুর্য্য ও রস সৃষ্টিতে চিত্তকে বেষ্টন করিয়া রাখিত; কিন্তু সকলের মধ্য দিয়া জীবনের রহস্যকে

আরও রহস্যময় করিয়া তুলিত, প্রশ্নের সমুদয় সমাধানের মধ্যে গভীরতর প্রশ্নের দ্বার খুলিয়া দিত, প্রহেলিকাকে আরও অজানিত অন্ধকারে আবৃত্ত করিয়া অন্ধকারের পরপারে আলোক রাজ্যের জন্য চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। হৃদয়ই জীবনের প্রস্রবণ—হৃদয়ই পূর্ণ জীবন—হৃদয় হইতেই জ্ঞানালোকের উদ্ভব—এই আলোক বুদ্ধিকে মার্জ্জিত, প্রখর ও আলোকিত করে;—হৃদয় বিশ্বাসের ভূমি,—বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন, সত্যের সাক্ষাৎকার বিশ্বাস, প্রেম ভালবাসার প্রাণ, সমাজের বন্ধন—বিশ্বাস নবসৃষ্টি এবং সৃজনীশক্তি—গৃহপরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও বিশ্বের জনয়িতা ও প্রতিষ্ঠাভূমি। এই হৃদয়কে সর্ব্বপ্রথমে পবিত্র ও ভগবৎ জীবনে অনুপ্রাণিত রাখিতেন—তাহাতেই তাঁর চরিত্রের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশ। তিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন যেমন শঙ্করের ভাষ্যে, তেমনই ভাস্করানন্দের জীবনে ও সাধনায় ও আশ্রম প্রতিষ্ঠানে; তিনি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন যেমন গীতায়, ভাগবতে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ও ধর্ম্মে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে; তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতেন যেমন বাইবেল গ্রন্থে, তেমনই খৃষ্টচরিত্র অনুধ্যানে ও Francis de Assissi প্রভৃতি মধ্যযুগের, ও General Booth প্রভৃতি আধুনিক খৃষ্ট ভক্তদিগের জীবন ও সাধনায়। তিনি চরিত্র হইতে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ও শিক্ষাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারিতেন না। আর ভগবৎজীবনের আত্ম-প্রকাশ ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা—তাহা হইতেই তাহার পরিচয় ও নব সমাজ ও নব সভ্যতায় তার নব নব অভিব্যক্তি। ইহারই নাম বিধান ও বিধান জীবন। বুদ্ধির আলোকে ভগবানকে জানা—এই একরূপ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিজ্ঞান। ভগবানের আত্মপ্রকাশে, এমন কি মহৎচরিত্র ও সকল চরিত্রের আত্মপ্রকাশেই ভগবানের ও মানব চরিত্রের জ্ঞান ও পরিচয়, ইহাই বিধানধর্ম্ম ও বিধানবিজ্ঞান। সকল ধর্ম্মই বিধান ও এক বিধানের ক্রম-

ত্রিকালের অন্তর্গত। এজন্য ধর্ম্মকে বিশ্লিষ্ট করা যায়না, যেমন বিশ্লেষণের দ্বারা জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়না। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম অখণ্ড জীবনের খণ্ড প্রকাশ, সেইজন্য সকল ধর্ম্ম সত্য, সকল খণ্ডধর্ম্ম এক অখণ্ড ভগবৎ-জীবনে 'বহু-একের' বিচিত্রতাময় সামঞ্জস্যে অভিনব প্রাণময় সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করে। ভগবজ্জীবনের এই নব পরিচয়ই নববিধান নামে অভিহিত। এই গ্রন্থে বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁর বিধান রহস্যের ব্যাখ্যা ও নববিধান বিবৃতি তাঁর প্রাণময় ভাষায় প্রদান করিয়াছেন; এবং জগতের মানব জাতির সভ্যতার ও সাহিত্য ও ইতিহাসের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে এত বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে যে পাঠক এক অভিনব তত্ত্বরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবেন, এবং বিশেষরূপে নববিধান-বিশ্বাসী সেবক ও প্রচারকগণ নূতন আলোকে চিত্তকে উদ্ভাসিত করিয়া নূতন বার্ত্তা প্রচার করিতে পারিবেন। এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া এই গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এই কার্য্যের জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও পাঠকগণের স্নেহদৃষ্টিই প্রকাশকের একমাত্র পুরস্কার—এই পুরস্কারই ভিক্ষা করি।

অনুজ—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন

৯২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা,
৭ই ভাদ্র, ১৩৩০ সাল।

আরতি

আজ একটী কথা প্রাণে গভীরভাবে জাগ্‌ল—ব্রহ্মের আরতির জন্য ভক্তের হাতে প্রদীপ কেন? ব্রহ্ম জোতির্ম্ময়—আপনার আলোকে আপনি উজ্জল—আবার দীপ কেন? ভক্তের হাতে কেন প্রদীপ? এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে এই বুঝলাম—প্রদীপ হাতে করবার অধিকার ভগবান কেবল ভক্তকে দিয়েছেন—কেবল মানুষকে দিয়েছেন। দেখ, জগতময় তাঁরই প্রকাশ—চন্দ্র সূর্য্য তাঁরই জ্যোতিঃ, অসীম আকাশে অসংখ্য তারার দীপমালা তাঁকেই প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকাশ দেখে কে? আকাশে তারা, কাননে ফুল—অগণন দীপরাজি—জ্যোতির্ম্ময়ে জগত পূর্ণ। কিন্তু কেউ তো দেখলে না তাঁকে—দেখলে কেবল তাঁর ভক্ত—তাঁর সন্তান মানুষ। এই মানুষ ব্রহ্মসন্তান; তাই ভগবান্ বল্লেন "মানুষ, তোমাকে আমি এই মহোচ্চ অধিকার দিলাম—তোমার হাতে দীপ থাকিবে। আমার মুখ তোমার ঐ দীপের জ্যোতিতে প্রকাশিত হবে"। কেন এই ব্যবস্থা? কে বলবে কেন? কিন্তু মানুষকে তিনি সর্ব্বোচ্চ অধিকার দিয়েছেন—তাই তিনি চান, মানুষের হাতে বিশ্বাস, ভক্তির দীপ জ্বলবে। তিনি আপনার জ্যোতিতে সন্তুষ্ট নন, তাই তিনি ভক্তকে—সন্তানকে গড়লেন। আর চাইলেন যে, তিনি যেমন জ্যোতির্ম্ময়, তেমনি জ্যোতিঃ ভক্তের হৃদয়ে জ্বলবে—তেমনি দীপ জ্বলবে—সেই দীপে আপনাকে দেখিয়ে তিনি কত সুখী। আপনার জ্যোতিতে প্রকাশ কর্‌লে মানুষ তাঁকে দেখতে পেত না—

একাশীতিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ১লা মাঘ ১৩১৭ সাল, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯১১, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

তিনি ভক্তের বিশ্বাস, ভক্তি দেখে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। যেখানে এ সব নাই—যেমন হিমালয়, পশু, পক্ষী, ফুল, ফল—তারা তাঁকে দেখলে না। মানুষের হাতে তিনি দীপ দিলেন—অন্তরে বিশ্বাস, ভক্তির আলোক প্রজ্বলিত করলেন—সেই দীপে তাঁর আরতি হয়—সেই ছোট দীপের কাছে বিশ্বপতি আপনাকে প্রকাশিত করলেন। এই কথা ভাবতে প্রাণে কত আনন্দ এল—ভগবানের এই ব্যবস্থা।

বন্ধুগণ, আজ আমরা কিসের উৎসবে প্রবেশ করেছি? উৎসব কেন? ব্রাহ্মসমাজ বিধাতার দান কেন? এই জন্যই কি নয় যে কবে আলো জ্বলেছিল, সেই আলো নিবু নিবু হ'য়েছিল—হিন্দুস্থানের কোটী কোটী সন্তান সত্বেও প্রদীপ নিবে এসেছিল—আর সেই অন্ধকার দূর করবার জন্য বিধান দীপ হাতে ক'রে এলেন? যে দীপ নিবেছিল, বিধান সেই দীপ আবার জেলে দিলেন? ভগবান্ বল্লেন—আমি জ্যোতির্ম্ময়, আমি বেদ বেদান্তের ঈশ্বর, কিন্তু তাতে হবে না—মানুষের হৃদয়ে আরতির দীপ জ্বালা চাই—হাজার হৃদয়ে, কোটী হৃদয়ে আবার এই দীপ জ্বলবে। আকাশে কত বা তারকা আছে, গগনে কত বা জ্যোতিষ্কমণ্ডল তাঁকে প্রকাশ করে! ভারতবর্ষ কোটী দীপে—আরতির দীপে—প্রেমভক্তির দীপে আলোকিত হবে। কোটী হাতের দীপ বিশ্বপতির সিংহাসনের চারিদিকে "মা" নামের ধ্বনি তুলে পরিবেষ্টন করবে। এই তাঁর সমাচার—এই আহ্বান—এই পবিত্র নিমন্ত্রণ বহন করে ব্রাহ্মসমাজ এসেছেন—তাই তাঁর জন্মোৎসব। তাই আনন্দের উৎসাহ, আশা, আকাঙ্খা, প্রার্থনা নিয়ে ভগবানের সিংহাসনের তলে এলাম।

৮১ বৎসর হ'ল ব্রাহ্মসমাজ এসেছেন—এতদিন ধ'রে এই দীপ জ্বালিয়াছেন—স্বর্গ হতে তাড়িতের মত অন্ধকারের ভেতর এই আলো জলেছে। কিন্তু ক'টী প্রাণে এই জ্যোতিঃ প্রতিষ্টিত হয়েছে, আজ

হিন্দুস্থানে কত ঘরে এই আরতির শঙ্খ বেজেছে ? আজ কি হিন্দুস্থানের হৃদয়ে কোটী তারার মত দীপমালা জ্বলছে ? কাণ শুনতে চায়—চোখ দেখতে চায়—কোথায় ? এখনও অন্ধকার, মোহ ! এখনও ঘণ্টা বাজে নি—এখনও শঙ্খধ্বনি "মা" নামের জয়গাথায় ভারতের আকাশকে ধ্বনিত করে নি। আরতির বাজনা কোথায় ? কোটী কোটী দীপ নিয়ে তাঁর আরতি হবে এই হিন্দুস্থানে, বিশ্বপতির সিংহাসন তলে। কই, সে দীপমালা তো এখনও জ্বলে নি ! ৮১ বৎসর কেটে গেছে—মনে হয় অনেক সময় ! কত হওয়া উচিত ছিল—কত হৃদয়ে দীপ জ্বলা উচিত ছিল। ধিক্কার আসে—দুঃখ লজ্জা আসে। আবার মনে হয়—এ হয়তো খুব কম সময়। যেখানে কোটী কোটী দীপ জ্বলবে—সেখানে ৮১ বৎসর কতটুকু সময় ? কালগর্ভের ভেতরে এ সময় মিশে গেছে—কিন্তু এই স্বর্গের বিজলী নিববে কে বলতে পারে ? এ জ্বলেছে, এ জ্বলবে—হৃদয় হ'তে হৃদয়ে যাবে এর জ্যোতিঃ, ভারত হ'তে অন্য স্থানে যাবে, সিন্ধুপারে, হিমালয় পারে ছুটবে এই স্বর্গের বিজলী—সমস্ত হৃদয় একটী বাতি, একটী উজ্জ্বল আলোকশিখা হ'য়ে যাবে—আর, জগত হবে আলোকমালা। হৃদয়ের অন্ধকারই কি সব পাপের মূল নয় ? হৃদয়ে যখন দীপ জ্বলবে তখন রোগ আসুক, শোক আসুক, কিন্তু মার নিজের হাতের জ্বালা দীপের আলোতে পাপ কখনও আসতে পারবে না। মার হাতের দীপ জ্বললে ভূত, প্রেতের ভয় কখনও থাকতে পারে ? যতক্ষণ দীপ জ্বলবে ততক্ষণ কণ্টকের ভয় নেই—পতনের ভয় নেই। আর যে দিন ঘুমের ঘোরে দেখব যে দীপ নিবে গেছে—আলো জ্বলছে না, সে দিন জগত অন্ধকার ! রাশি রাশি ধনসম্পদ যদি পাই, কোথায় যাব ? সব যে অন্ধকার ! না দেখি জগদ্বাসীর মুখ, না দেখি কোন পথ ! স্বর্গের দীপ, যদি তুমি জ্বল হৃদয়ে—সংসারে ভয় নেই, তা হ'লে আমি নিরাপদে চলি ; আর, তুমি যে দিন নেব সে

দিন সংসারের সব সুখসম্পদ কোথায় কোন্ শূন্যে মিলিয়ে যায়! এই দীপ সকলের হৃদয়ে জ্বলবে তাই ব্রাহ্মসমাজ—বিধান। ৮১ বৎসর এই বিধান কত ক'রে জ্বালিয়েছেন এই দীপ।

প্রথম জ্ঞানের জ্যোতিঃ। রাজা রামমোহন জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকারে প্রকাশিত হ'লেন। ভারতবাসীকে তিনি বল্লেন—অন্ধকারে থেকো না, জ্ঞানদীপকে জ্বাল,—আর তার সঙ্গে বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য। বিশ্বাস জলন্ত দেবতাকে উজ্জ্বল করলেন। যে দেবতা জীবন্ত নয়, তাঁকে বিশ্বাস করা যায়? জীবন্ত দেবতা চাই। কিন্তু কে প্রকাশ করবে সেই দেবতাকে? বিশ্বাস। তাই এ আহ্বান—জীবন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর। মানুষের হাতের গড়া দেবতা নয়; বিশ্বপ্রাণ—জগতজীবন, তোমার প্রাণ, তাঁকে বিশ্বাস ক'রে প্রাণ ধর। আর তার সঙ্গে বিবেক। দেবতা বিবেকের বাতি জ্বালালেন, কর্ত্তব্যের পথ ঠিক করবার জন্য। আর এই সঙ্গে বৈরাগ্য। দেখ, মানব, তুমি অনন্তের সন্তান। হে অনন্তজীবনের অধিকারী, ছোট জিনিষে ম'জো না। বৈরাগ্য আনন্দত্যাগ নয়—বৈরাগ্য ক্ষুদ্রতা-ত্যাগ—ছোট জিনিষ হ'তে প্রাণের বন্ধন খুলে নেওয়া। যে জিনিষ পোকায় খায়, আগুণে নষ্ট হয়—যা তোমাকে কাঁদিয়ে চলে যায়, যাকে ফেলে তুমি চলে যাও—তাকে ভালবাসা, সে তো চরম দারিদ্র্য। দেখ তোমার কি অতুল সম্পদ—কি পরম ধনের অধিকারী তুমি। এ সম্পদ দেখলে হৃদয় বিরাগী হয়, আর ছোট জিনিষে মমতা রাখে না। সংসারের বিত্ত-বিভব মান-সম্ভ্রম তোমার জীবনের ব্রত পালনে সহায় মাত্র—তোমার হাতের যন্ত্র। কিন্তু অনন্ত জীবনের আহ্বান এলে, এ যন্ত্র তুচ্ছ হ'য়ে যাবে। তখন, অনন্ত জীবনপথের যাত্রী, এ সব ছেড়ে, আনন্দে গান করতে করতে চলে যাবে।

ব্রাহ্মসমাজ এই ক'রে আরম্ভ ক'রলেন। কিন্তু এই সঙ্গে ও

সব আবার কি এল ? এর পাশে অত কোমল, অত মিষ্ট ও কি ? প্রেম, ভক্তি এসেছেন। কবে বিধাতা এ কোমল দীপটী জ্বালিয়ে দিলেন ! বিবেক হৃদয় শুদ্ধ ক'রেছিলেন—তারপর অশ্রু তেলের মত হয়ে সেখানে পড়েছিল—সেই তেলকে আশ্রয় ক'রে এই দীপটী জ্বলে উঠলো। বিধাতা কবে চুপি চুপি এসে এই রসের বাতিটীকে হৃদয় মন্দিরে জ্বেলে দিলেন ! তারপর আরো ও কি দীপ ? সাধুভক্তি, ধর্ম্মসমন্বয়ের দীপ। সাধুদের নিয়ে জগত এত রক্তারক্তি করলে—"আমার সাধু" "আমার সাধু" বলে পৃথিবীতে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, কিন্তু বিধান বল্লেন "সকল সাধুই আমার আপনার"। সকলেই যে সেই এককে ডেকেছেন, কত মিষ্ট স্বরে—তাঁদের সকলের পদধূলি নিই মাথায়। তখন বিধানের পবিত্র আলোকে দেখলাম—কোথায় সম্প্রদায় ? কোথায় জাতিতে জাতিতে বিভেদ ? যিনি ঈশাকে মানেন, তাঁকে আমি ভালবাসব না ? আমিও যে ঈশাকে ভক্তি করি। যিনি মহম্মদকে মানেন—যিনি চৈতন্যকে মানেন—যিনি বুদ্ধের নামে আপনার জীবন উৎসর্গ করেন—তাঁরা সবাই কি আমার ভাই নন ? এতে কত সহজে জগতশুদ্ধ লোক আমার আপনার হ'ল—কত সহজে সকল ব্যবধান ঘুচে গেল ! এই স্নিগ্ধ সমন্বয়ের দীপ কবে ভগবান্ জ্বালালেন !

বিধাতা ধীরে ধীরে এতগুলি দীপ জ্বালিয়েছেন—এতগুলি দীপ ! তিনি সমাজের গলায় বিধানের মালা, মাথায় বিধানের মুকুট, হাতে পবিত্র বিধান নিশান দিয়েছেন। তবে দীপ কি জ্বালাবে না ? দীপের আলোকে ভারতকে আলোকিত ক'রবে না ? ভারতকে নিয়ে সমস্ত জগত আরতির মহোৎসব সৃজন ক'রবে না ?

মাঘোৎসব মানে দু'দিনের উৎসব নয়—দু'দিন থেকে ঘরকে শূন্য ক'রে চলে যাবে এ সে উৎসব নয়। এ এসেছে দীপ জ্বালাবার জন্যে।

এস তবে আমরা আপনাদের হৃদয়ে দীপ জ্বালি, আর যাতে অপরের হৃদয়েও এ দীপ জ্বলে সেই চেষ্টা করি। আমরা হৃদয়কে প্রস্তুত করি—অন্তরকে নির্ম্মল করি। তিনি দীপ জ্বালাবেন, সকলে প্রস্তুত হও—ঘর বাড়ী পরিষ্কার কর, পবিত্র ব্রত নাও, মঙ্গলময় আসন রচনা করবেন—সকলে শুদ্ধাচার হ'য়ে প্রতীক্ষা কর। তোমার ঘরে আসবেন ঠাকুর, তুমি চারিদিকে বিশৃঙ্খলা রাখবে? ঘর বাড়ী সাজাবে না? আসন পাতবে না? পবিত্র বসনে সাজবে না? সকলকে উৎসবের বেশে সাজাবে না? উৎসব কে করতে পারে যদি তিনি নিজে উৎসব না পাঠান? সম্রাট, বাদসা উৎসব করেন—তাঁদের ধন আছে, তাঁদের সেই উৎসব। আমাদের কিসের উৎসব? ঈশার একটী গল্প আছে। কোন রাজার ঘরে উৎসব; তিনি সব ধনীকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন; ধনীরা সবাই বল্লেন—অবকাশ নেই। তখন রাজা দূত পাঠালেন, ডাক সব কাঙ্গালকে, ফকিরকে, তাদের জন্যই উৎসব আয়োজন, তা'দের ডাকলে আয়োজন সার্থক হবে। আমাদের কিসের উৎসব? রোগ, শোক, যন্ত্রনায় যারা অস্থির তাদের উৎসব নেই। কিন্তু দেখ রাজরাজেশ্বর যিনি তাঁর এ আহ্বান—তিনি যা দিতে পারেন তাই নিয়ে উৎসব। অসীম আকাশ তাঁর জ্যোতিতে পূর্ণ, তা দেখে পূর্ণ হতে পারে এ অধিকার কার না আছে? কোন্ দরিদ্রের অধিকার নেই হিমালয়ের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'তে? হৃদয়ে শুদ্ধতা, জ্যোতিঃ আসবে—সেখানে সুন্দর ভক্তির ফুল ফুটবে, সে ফুলে দেবতার চরণ পূজার অধিকার কোন্ কাঙ্গালের নেই বল? কোন্ রাজার এ ঐশ্বর্য্য আছে যে চোখ খুলে তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখতে পায়—কোন্ সম্রাটের সেই ঐশ্বর্য্য আছে যা দিয়ে দরিদ্র ফুলে ফলে, আকাশে, ভাই বন্ধুর মুখে সৌন্দর্য্য উপভোগ করে? এ উৎসব জগতের সব উৎসবকে পরাস্ত করে। আমরা কাঙ্গাল, কিন্তু রাজরাজেশ্বর পবিত্র বিধানের বসন্ত পবনকে

আকাশ ভ'রে রইয়েছেন, অজস্রধারে আনন্দের ধারা ঢেলে দিয়েছেন। তবে আমরা ঘর সাজাই, ছেলে মেয়েদের পোষাক উজ্জ্বল করি, হৃদয়কে প্রস্তুত করি—তাঁকে অবকাশ দিই, তিনি হৃদয়ে আসুন। এ উৎসব শুধু এক ঘরে নয়—এঘরে ওঘরে, এদেশে ও ওদেশে, ভারতে, জগতে। সর্ব্বত্র বইবে তাঁর আনন্দের ধারা। আমরা আয়োজন করি যাতে একটী দীপ হ'তে অসংখ্য দীপ জ্বলে' দীপমালায় জগত আলোকিত করে। তারই জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করি—মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ করুন।

আকাঙ্ক্ষা পূরণ।*

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা—
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥—ভাগবৎ।

ঈশ্বর মনুষ্যগণের প্রার্থিত বিষয় অর্পণ করেন, একথা সত্য, কিন্তু তিনি ভক্তগণকে সামান্য বিষয় দেন না, কেন না তাহা পাইয়া প্রার্থনার নিবৃত্তি হয় না। সমুদয় কামনা-পরিশূন্য হইয়া যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং সমুদয় অভিলাষের পরিসমাপ্তিকর নিজ পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

ভাইগণ, ভগ্নিগণ, পবিত্র উৎসবের দিন আজ। পবিত্র উৎসবের দিন পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে সকলে যে এলেন, হৃদয়ের ভিতর কি কোনও কামনা নিয়ে আসেন নি। কোন্ মনোবাঞ্ছা হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে

---

* দ্বাশীতিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১১ই মাঘ ১৩১৮ সাল, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯১২, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব উপলক্ষে সায়ংকালীন উপাসনার সময় বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

এখানে এলেন? বৎসরের এই উৎসবের দিন, আনন্দের দিন সকলে কত ব্যকুলতা নিয়ে এলেন? যুবক এলেন, বৃদ্ধ এলেন, বালক এলেন, প্রৌঢ় এলেন, মাতৃগণ ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে এলেন—ঘরে ছোট শিশুকে রেখে আসতে না পেরে কোলে নিয়ে এলেন—কিসের জন্য এত ব্যাকুলতা হৃদয়ের মধ্যে?

ভগবান্ অভিলাষ পূর্ণ ক'রবেন। রাজরাজেশ্বর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, বর দেন তিনি, যার হৃদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা তা' পূর্ণ করেন তিনি,—কোন্ আকারে?

এই প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করি, মনোবাঞ্ছা কি, হৃদয়ের অভিলাষ কি? দিনের পর দিন চলে যায়, মনোবাঞ্ছা মনে আসবার অবকাশ নাই। যদি আসে—আজ অমুকের রোগ হল, রোগ যদি চলে যায়; দারিদ্র্য এল, দারিদ্র্য যদি চলে যায়; সংসারের সুখ হউক, দুঃখ চলে যাক। মনোবাঞ্ছা এর বেশী আর কি? কারো, কারো হয়ত সংসারের সুখ বর্দ্ধিত হউক, ধন হউক, মান হউক, এই আকাঙ্ক্ষা। আমি বলছি না যে এই আকাঙ্ক্ষা হ'লে দোষ হয়। যদি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে সরল প্রাণে—বলি বলতে হয়, কত লোকের আকাঙ্ক্ষা সংসার সুখের হ'ক, দুঃখ চলে যাক, ধন আসুক, জন আসুক—কত লোকের এই আকাঙ্ক্ষা।

এই যে শ্লোক পড়া গেল—ভগবান্ সকলের মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। রাজ্য যে চায় সে রাজ্য পায়। আরঙ্গজীব রাজ্য চেয়েছিলেন, রাজ্য পেলেন,—কি রকম রাজ্য? পিতার রক্তে রঞ্জিত রাজ্য—সাজাহানের রক্তে রঞ্জিত! কি রকম করে সে রাজ্য ভোগ করেছিলেন? মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন আরঙ্গজীব অতি ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য রাজ্য চেয়েছিলেন, তিনি তা' পেয়েছিলেন।

আমরা গীতায় পড়ি কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে রাজ্য গ্রহণ ক'রতে বলেছিলেন, তখন অর্জ্জুন বলেছিলেন, এই যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ও ভাইদের রুধিরে রঞ্জিত রাজ্য, এ নিয়ে আমি কি করব ? তিনি সে রাজ্য চান নাই।

সেণ্ট ফ্রান্সীস ডি, আসিসি কি চেয়েছিলেন ? পিটার কি চেয়েছিলেন ? ঈশার পদানুসরণ ক'রে, খ্রীষ্ট যে রাজ্য চেয়েছিলেন, তিনি সেই রাজ্য চেয়েছিলেন। পিটার বল্লেন এত সৌভাগ্য আমার হবে ? ঈশার যে প্রাণদণ্ড হয়েছিল সে সৌভাগ্য আমার হবে ? আমি তার অযোগ্য ; আমায় যদি ক্রুশে দেবে, আমার মাথা নীচুদিকে রেখো, পা উপরদিকে রেখো। * * * সেণ্ট ফ্রান্সীস কি চেয়েছিলেন ? ঈশার মত তাঁর অবস্থা হবে ; তাঁকে ক্রুশে দেবে। তাঁকে সত্যি সত্যি ক্রুশে যেতে হয় নি, কিন্তু ঈশার পায়ের, হাতের যে ক্ষত চিহ্ন তাই নাকি তাঁর হাতে, পায়ে দেখা দিল। দিন রাত্রি তাই ভেবে ভেবে, ঈশার মত তাঁর অবস্থা হ'ল। বিধাতা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রলেন।

ধ্রুবের মনোবাঞ্ছা এই ছিল—কোথায় দীনবন্ধু হরি ; তুমি আমাকে দেখা দাও। তিনি দেখেছিলেন। কোন্‌রূপে তিনি দেখেছিলেন ? সেই ভুবনমোহনরূপ—যে রূপ দেখে তিনি মোহিত হয়েছিলেন। অর্জ্জুনের মনোবাঞ্ছাও তাই ছিল ! সখা ব'লে ঈশ্বরকে পাওয়া ;—সখা এসেছেন সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে, রাজ সম্পদ নিয়ে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রেছেন। সখা শ্রীহরি বনবাসের সহচর—বিপদে, কর্ম্মের মধ্যে সখার হাসি বনবাসের দুঃখকে আসতে দেয় না, বনবাসের মধ্যে এমন সুন্দর আনন্দ। সখা যেখানে, প্রাণ সেখানে। কোন্ মুহূর্ত্তে কোথা যেতে হবে জানি না, সখা সেখানে রথের সারথী, সখা বিপদ প্রলোভনের মধ্যে পথ দেখিয়ে দেন, নিয়ে যান হাত ধরে যে পথে

যেতে হবে। সম্পদের সঙ্গী, দুঃখের সঙ্গী, বনবাসের সাথী সেই সখা, সেই সখার মুখের দিকে বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে অর্জ্জুন তাকিয়েছিলেন, দেখলেন সেই সখার রূপ—অনন্ত বাহু, শশি সূর্য্যনেত্রম্, বিশ্বময় রূপম্—তখন অর্জ্জুনের চোখে জল পড়েছিল, বল্লেন—"হে কৃষ্ণ, সারথী, আমি তোমাকে সখা বলে ডেকেছি, তোমাকে কৃষ্ণ বলে চেয়েছি, যাদব বলে ডেকেছি—এ আমি তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে সখা বলে তোমার অপমান করেছি, এ সকল অপরাধ ক্ষমা কর। বিশ্বপতি, তোমার প্রলয়মূর্ত্তি দর্শনে বিশ্বসংসার চূর্ণ হয়ে যায়। আমি তোমায় সখা বলে ডেকেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর"।

সখা বলে আমরা তাঁকে ডাকব; কত সময় মন চায়, আনন্দের ভিতর, সুখের ভিতর তিনি সঙ্গী হবেন; জীবনের সংগ্রামের ভিতর তিনি সারথী হবেন এই মন চায়। সেই গল্পে পড়েছিলাম, মুশা রাখাল বালকের মুখে শুনেছিলেন "এস, আমি তোমার কেশবিন্যাস করে দেব"। আমাদেরও ঐ বালকের মত বল্‌তে ইচ্ছা হয়—এস, সখা হয়ে জীবনে এস। অন্য ধন কে চায়! আসুক বিপদ, আসুক, সমস্ত জীবনের দুঃখ বহন ক'রব, যদি সখা তোমার দর্শন পাই। নির্জ্জন নদীর তীরে তোমাকে নিয়ে ব'সব, ঘরের ভিতরে তোমাকে নিয়ে ব'সব, জীবন সফল হবে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চিরদিন আনন্দে থাক্‌ব।

তাই, ভাই ভগ্নি, আবার প্রশ্ন করি, কোন্ কামনা, কোন্ বাঞ্ছা নিয়ে এসেছ? শ্লোকে পড়লাম বিধাতাপুরুষ যিনি তিনি ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন না। কেবল ভক্ত সমস্ত কামনাপরিশূন্য হৃদয়ে যাহা তাঁর কাছে চান, তাকে তিনি তাই দেন। তাই আবার জিজ্ঞাসা করি যে সমস্ত কামনাপরিশূন্য হৃদয়ে কি তাঁকে চাও? এ কথা খুব সরল হয়ে বলতে হবে, দায়িত্ব ভুলে নয়। আমাদের

ঘর আছে, বাড়ী আছে, সমস্ত সংসার চালাতে হয়। এই যে ভাগবতে পড়লাম এই দায়িত্বের কথা, সে কথা থাকুক, যিনি বুদ্ধদেবের মত সমস্ত পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারেন তার জন্য থাকুক। আমরা কি তা পারি, প্রত্যেকে আত্মপরীক্ষা করি, দেখি কামনাপরিশূন্য হ'তে কি পারি, তা কি সম্ভব? সে কথাটা ভাল করে দেখি। আমি বলি সমস্ত মানুষে চায়—হৃদয়ের পরিতৃপ্তি। তাহা না হ'লে জীবন পূর্ণ হয় না। অনেকে জ্ঞান চান, জ্ঞান পেয়ে কি হ'ল? খুব শক্তি হ'ল, কাজের ভিতরে রহিল, খুব কাজ ক'রল, ঘর সংসার ক'রল; হ'ল না, হৃদয় খালি রয়েছে। হৃদয় যিনি এসে পূর্ণ করেন, তাঁর ভিতরে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি। এ কথা যদি মানেন, গল্পে যেমন পড়লাম, সাইলাস মার্ণার, সোণার মোহরগুলি ভিন্ন তার আর কিছুতে মন ছিল না, রাত্রি বেলা গুণত, দিনের বেলা লুকিয়ে রাখত। একদিন সে একটি ছোট শিশুকে পেল, হৃদয়ের মধ্যে যে ছোট শিশু লুকিয়ে ছিল তার হাসি কান্না তার হৃদয়ে জুড়ে বস্‌ল। ছোট একটু শিশুকে, বন্ধুকে ভালবেসে হৃদয় পূর্ণ হয়, নতুবা হৃদয় খালি।

ভাই ভগ্নি, জিজ্ঞাসা করি, এ উপাসনা মন্দির, এখানে জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আছে, মনে করো না খুব স্বাধীনতা নিচ্ছি। পেয়েছ অনেক ধন, সংসার পেয়েছ, ধন পেয়েছ, স্বামী পেয়েছ, স্ত্রী পুত্র পেয়েছ, বল হৃদয় কি পূর্ণ হয়েছে? না শূন্য আছে? হৃদয়ের কোনখানটা খালি রয়েছে? বল যদি কোথাও অপূর্ণতা থাকে, তোমার জীবন যদি কখনও নিরানন্দ হয়, তোমার মুখ যদি কালিমাময় হয়, একি সেই জন্যে নয় যে হৃদয় খালি আছে? এই অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে যদি তাঁকে ডাকৃতে পার তবেই পূর্ণ হবে। সংসারে অনেক ভালবাসা পেয়েছ, হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছ, সুখের আশায় ছুটেছ, ঘুরেছ; এখনও যদি হৃদয় খালি থাকে, এ কথা কি বলতে

পারবে না—আমার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত কর, শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ কর? যে এ কামনা করে সে এই পাদপল্লব লাভ করে। পাদপল্লব শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করে, পরিতৃপ্ত করে। ভাই ভগ্নি, আজ হৃদয়কে তাঁর প্রেমে পূর্ণ ক'রে, পরিতৃপ্ত ক'রে সংসারের মধ্যে বস। ভিখারীর বেশে ঘুরেছিলে, কে একটু ভালবাসা দেবে, একটু স্নেহ দেবে। আজ প্রেমময়ের ঘরে এসে পূর্ণহস্তে ফিরে যাও, আজ তোমার ধনভাণ্ডার পূর্ণ। আজ তোমার সমস্ত ভালবাসা, প্রীতি, তাঁর পাদস্পর্শে সুন্দর হয়ে গেছে, আজ তোমার হৃদয়কে পূর্ণ কর্লেন। ঈশা কি চেয়েছিলেন, কে কি দিয়েছিল তাঁকে? তাঁর জীবন পূর্ণ করে, সুন্দর করে সেই পাহাড়ের উপরে কে এল? তিনি ঘুরেছিলেন পথে পথে, সেই প্রেম দিবার জন্য। তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল, ভগবান্ তাঁর পাদপল্লব দিয়েছিলেন।

ভাই ভগ্নি, যদি মনোবাঞ্ছা থাকে, তাঁর প্রেমে হৃদয়কে পূর্ণ কর। কোমলতার অভাব থাকবে না। আনন্দে তোমার হৃদয় পূর্ণ হবে, তুমি রাজবেশে সংসারে ঘুরবে, সমস্ত আনন্দ পেয়ে তোমার জীবন পরিতৃপ্ত হবে।

*　　*　　*　　*

এই স্পর্শমণির কথা বল্লাম, যার স্পর্শে সমস্ত সংসার সোণা হ'য়ে যায় সেই স্পর্শমণির কথা আরও দুই একটী বল্তে দাও।

আজ সকালে ত শুন্লে বিশেষ দিন এসেছে। বিশেষ দিন ত প্রতিদিনই। রাজা এলেন, সম্রাট এলেন, তাতে বিশেষ দিন কি হ'ল? ভাই ভগ্নি, তা কি বল্ব? ভারতবর্ষের মুখকে উজ্জ্বল করে দিয়ে গিয়েছেন তিনি, ভাব্লে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। এই ভারতবর্ষ কোথায় নীচ, হীন হয়ে পড়েছিল, এ গৌরবান্বিত ভারতবর্ষ পদানত অগৌরবান্বিত হয়ে পড়েছিল, তিনি এসে তুলেছেন। ইংরেজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে বিজেতা বিজিতের সম্পর্ক নয়। তিনি

ভারতবর্ষের কাছে আপনার নিমন্ত্রণ আপনি নিয়ে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করলেন।

বন্ধুগণ, ভারতবর্ষে যখন বেদগান হ'ত, জাবালি শিশু এসে ঋষিকে বল্‌ল, আমাকে বেদগান শিক্ষা দিন। ঋষি বল্লেন তোমার কি জাতি, কি বংশ ? সে বল্‌ল আমি বাড়ী গিয়ে মার কাছে জিজ্ঞাসা করব। মার মাথা হেঁট হ'ল যখন বালক জিজ্ঞাসা কর্‌ল; মা বল্‌লেন তুমি হীন জাতি। আবার সে ফিরে গেল, গিয়ে বল্‌ল আমি হীন জাতি। বনবাসী বালকদিগের রোল উঠ্‌ল এ নীচজাতি, এ আসে বেদগান করতে, এত বড় আস্পর্দ্ধা ! ঋষি জাবালিকে বল্‌লেন, বালক তুমি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, তুমি বেদগান পাঠের যোগ্য। কেন এই গল্প বল্‌লাম ? ভারতবর্ষ, তুমি উচ্চ কথা বল, উচ্চ আদর্শ দেখাও। সেই বনবাসী শিশুদের মত চারিদিকের যত দেশ তোমাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। এ অবস্থায় তোমাকে তুলেছেন কে ? ইতিহাসে সে কথা লেখা থাক্‌বে। রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষকে কোথায় তুলেছিলেন, ইতিহাস সে কথা প্রকাশ করছে। তাঁদের উচ্চ জীবন, উজ্জ্বল চরিত্র এ দীন হীন ভারতকে সমস্ত জগতের কাছে তুলেছিল, সমস্ত জগৎ তাকিয়েছিল, বলেছিল আবার ব্রহ্মবাণী এসেছে; স্বাধীন আমেরিকা, স্বাধীন ইংলণ্ড, স্বাধীন জার্ম্মানি অবাক হয়ে শুনেছিল। তাতে কি হয় ? ক'টি লোক ভারতবর্ষকে সম্মান করে ? সিকাগোর মহামেলায় প্রতাপচন্দ্র গিয়েছিলেন, সেখানে যত লোক এলেন তার মধ্যে ক'টি লোক ভারতবর্ষকে সম্মান দিতে শিখেছেন ? তাঁদের নিজের গুণে কেউ কেউ সম্মান দিয়েছেন। কোথায় ভারতবর্ষ দীন হীন, সে দেশ এত বড় কথা বল্‌বে, ব্রহ্মের কথা,—ভাবতে পারেন না। আজ সম্রাট এসে বল্লেন জাবালীর মত হীনতা, এ রাজনৈতিক অধীনতা থাক্‌বে না। আজ ভারত কৃতজ্ঞতা দেখাও, প্রার্থনা কর তাঁর জন্য।

ভারতবর্ষকে যে উচ্চ অধিকার রাজা রামমোহন দিয়েছেন, ব্রহ্মানন্দ দিয়েছেন, সে অধিকারের উপযুক্ত হও। ভারতবর্ষ কি দাঁড়াতে পারবে না? ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি, রুশিয়া, তাদের সভায় কি নিয়ে তুমি বস্‌বে? সকল কামনার পরিসমাপ্তিকর যে তাঁর চরণ, সেই স্পর্শমণি নিয়ে বিশ্বের মাঝখানে বসো। বসো সন্ন্যাসী ভারত, তুমি তোমার বৈরাগ্য নিয়ে বসো; তপস্বী ভারত, সকল কামনার পরিসমাপ্তিকর ব্রহ্মপদ বক্ষে নিয়ে বসো। চলেছে সমস্ত জগত। পাশ্চাত্য জগত উন্নতির পথে চলেছে, চলুক। ভারত, তোমাকে ও পথে যেতে হবে না, তাঁর পাদস্পর্শ লাভ করে বিশ্বের জাতিদের মধ্যে তুমি বস্‌বে। ভাই ভগ্নি, এ যে কল্পনার কথা নয়। সেই অধিকার এসেছে তোমার জন্য, আমার জন্য। আমরা দুর্ব্বল, পরাধীন; এ যে ভক্তির স্রোত, তা'তে যখন আমাদের দুর্ব্বলতার মধ্যে ফেলে দেয়, তখন ভক্তির পথে কি করে যাব? ভাইগণ ভগ্নিগণ, আমাদেরও কাজ আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন তার মধ্যে কি কঠোরতা ছিল না? ঈশা, শ্রীচৈতন্য তাঁরাই ত সেই পথ দেখিয়েছেন। ভাইগণ, তোমাদের সে কাজ করতে হ'বে, ভক্তি প্রেম দুর্ব্বলতা নয়, কঠোর ভিত্তির উপর জীবনকে গড়। কঠোর কামনার নিবৃত্তির পথে সকল বাসনার পরিসমাপ্তি, জীবনের উন্নতির সোপান। জেনো কঠোরতা, সংযম, পবিত্রতা ভিন্ন জীবনকে গঠন করতে পারবে না। এ না হ'লে ভারতবর্ষ আপনার উন্নতির অবস্থা লাভ করতে পারবে না। আর ভগ্নিগণ, যে দেশে সীতা সাবিত্রীর জন্ম, সে দেশে কামনার পরিসমাপ্তি—সে কথা কি বল্‌তে হবে? এই ভারতের নারীগণ, পাশ্চাত্য আদর্শে সীতা, সাবিত্রীর জীবনকে ভুলে, বাহিরের চাক্‌চিক্যে সে কথা কি ভুলে যাবেন? না, না, তোমরাই পবিত্রতা দেবে; এই দেশকে উন্নত করতে হবে, সমস্ত জাতিদের মধ্যে এই পতিত দেশকে

এনে বসাতে হবে। শান্তি, আনন্দে তোমাদের জীবন পূর্ণ হউক, সংসার উন্নত হউক। আদর্শ জীবন গঠন করতে, বৈরাগ্যের জীবন গঠন করতে তোমারই সাহায্য শক্তি দান করবে, সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবে। কামনার পরিসমাপ্তি ক'রে তোমাদের জীবন তাঁর চরণে উৎসর্গীকৃত হ'ক। ভাই ভগ্নি, সেই মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে না? সে মনোবাঞ্ছা যিনি দিয়েছেন আমাদের জীবনের সমস্ত প্রেম, ভক্তি তাঁর চরণে দান করি। তিনি জীবনের পবিত্রতা দিন, সেই পবিত্রতা সম্ভূত ঐশ্বর্য্য নিয়ে জীবনকে, সংসারকে পূর্ণ করি। এই যে ভারতবর্ষ, তাঁরই আশীর্ব্বাদ নিয়ে, তাঁর পাদস্পর্শ পেয়ে, জগতের ইতিহাসে তার স্থান লাভ করুক।

স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ।*

"And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these."

"But seek ye first the Kingdom of God, and His righteousness; and all these things shall be added unto you.

Take therefore no thought for the morrow."

St. Matthew, Ch. VI

* দ্বাশীতিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ২৭শে জানুয়ারি, ১৯১২, যুবকদিগের প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশ।

এই যে ঈশার কথাগুলি পড়লাম, এই কথা নিয়ে বিশ শতাব্দী কত নাড়া চাড়া ক'রেছে, এই বিষয়ে ভেবেছে, একে ধ্যানে, জীবনে, কার্য্যে পরিণত ক'রতে চেয়েছে। আজ এই বিজ্ঞান-আলোকিত বর্ত্তমান সময়েও এর গভীর রহস্য ভাবতে ভাবতে জ্ঞান, বুদ্ধি আত্মহারা হয়, এর কোন কূল কিনারা পায় না। কথাগুলি শুনতে খুব সহজ—কিন্তু এর কত ব্যাখ্যাই না হয়েছে, মানুষ কত ভাবে কত রকমেই না একে বুঝেছে। ঈশার ঠিক পরবর্ত্তী শিষ্যেরা—যাঁরা তাঁর ধর্ম্ম পালন করতে গেলেন—তাঁরা এবিষয়ে কত ভেবেছেন, এর রহস্য বুঝতে চেষ্টা ক'রেছেন। খ্রীষ্টীয় জগতের ইতিহাসে এর কত ব্যাখ্যাই দেওয়া হ'য়েছে।

ঈশা বল্লেন—সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, অন্য যাবতীয় বস্তু তোমাদের দেওয়া হবে। কত রকমেই একথার অর্থ বোঝাবার চেষ্টা হ'ল! প্রথমে ভেবে দেখি, ঈশার শিষ্যদের কথা। কল্যকার জন্য ভেব না, ঈশার এই বাক্যকে তাঁরা জীবনের ব্রত ক'রলেন, এ হ'তে সন্ন্যাসিগণের সৃষ্টি হ'ল। Monks, Nuns, Monastic Orders গঠিত হ'ল। ঈশার অনুচরগণ এই ব্রত পালনে জীবন উৎসর্গ করলেন। তারপর Dominican Friars, Franciscan Friars, Poor Brothers এঁরাও দারিদ্র্যের ব্রত নিলেন। ইটালীর অন্যান্য দেশেও গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদলের অভ্যুদয় হ'ল—তাঁরা অনাবৃত পদে, সামান্য পোষাকে, বরফের উপর দিয়ে প্রাণের আবেগে বার হ'য়ে পড়লেন। কোথায় কোন্ গ্রামে প্লেগ, কোথায় ব্যাধির যন্ত্রণা, কোথায় রোগীর আর্ত্তনাদ—তাঁরা আর্ত্তের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। এমনি করে কত সন্ন্যাসীদলের গঠন হ'ল।

আবার আর একদিকে দেখি, ঈশার এই কথার ঠিক বিপরীত ব্যাখ্যা করা হ'ল। তা হ'তে হ'ল—Crusades বা ক্রুশের যুদ্ধ—

প্রথমে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর—ঈশার এই কথা পালনের জন্য, একদল লোক বর্ম্মে দেহ আবৃত ক'রে, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে, প্রাণে জ্বলন্ত উৎসাহ নিয়ে চারিদিকে ছুটলো। কেন? ঈশার সমাধিকে মুসলমানের হাত হ'তে উদ্ধার করবার জন্য—বিধর্ম্মিকে খৃষ্টীয় জগত হ'তে দূর ক'রতে হবে, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। এই এক রকমের ব্যাখ্যা।

আরো এক রকমের ব্যাখ্যা হ'ল। ইংলণ্ডের একদল লোক—যাঁরা Puritan নামে পরিচিত—তাঁরা ব্যাকুল হ'লেন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁরা জীবনের সংকল্প করলেন ভগবানের কথা শুনে চলবেন। তাঁরা যখন দেখলেন রাজা এ পথের বিরোধী, তখন তাঁরা রাজার শিরশ্ছেদ করলেন। আবার যখন দেখলেন দেশের সভা এ ব্রত উদ্‌যাপনের পথে অন্তরায়, তখন তাঁরা সভাকে উঠিয়ে দিলেন। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উগ্র উৎসাহে উত্তেজিত হ'য়ে তাঁরা নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিলেন। কঠোর সংযম ও শাসনের ভিতর দিয়ে তাঁরা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন।

এত রকমের ব্যাখ্যা! এই বিংশ শতাব্দীর সমুন্নত সভ্যতা ও বাণিজ্য, ব্যবসায়, রাজনৈতিক উন্নতির যুগেও মানুষ কি এ কথা ভুলেছে—একে কি দূরে ঠেলে ফেলে দিতে পেরেছে? কবির বাণী যে এই কথায় সায় দেয়—মনের নিভৃত সুপ্ত তন্ত্রী যে এর সুরে বেজে ওঠে—হৃদয় অবাক, স্তব্ধ হয়ে এই কথা ভাবতে থাকে। এ কথা কি ভোলবার? না এই কথার ভিতরে কোন গভীর অর্থ আছে, এর রহস্যের ভিতরে কোন অমৃতের আস্বাদন আছে? এর মূল্য যাচাই ক'রতে হবে, এর তত্ত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা ভাল ক'রে বিচার করতে হবে। যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, বিশেষতঃ যাঁরা নববিধানের লোক তাঁরা কি ভাবে এই কথা নেবেন? কেশব বল্লেন—

ঈশার কথা স্মরণ কর; তিনি ব'লেছেন—পদ্মগুলির দিকে চেয়ে দেখ, তারা পরিশ্রম করে না, তারা কিছু ভাবে না, কিন্তু তাদের যে অপূর্ব্ব সজ্জা তেমন সজ্জা রাজা Solomonএরও নাই। পদ্ম যদি সজ্জিত হয়, ব্রহ্মসন্তান, তোমারা তবে সজ্জিত হবে না কেন?

ঈশা বল্লেন, কল্যকার জন্য ভেবো না। এ কথা শুনলে প্রথম মনে হয়, এটা বুঝি আলস্যের আত্মরক্ষা, যথেচ্ছাচারীর পাপের সান্ত্বনা, বুঝি নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদীর কল্পনা-রচিত আরামকুঞ্জ, অথবা এটা কেবল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী জীবনের কঠোর শুষ্ক ব্রত! এই বঙ্গদেশে বহু শ্রমজীবী আছে, তারা অলস, শ্রমবিমুখ। চার পয়সা তারা রোজগার করে, চার পয়সায় তাদের অভাব মেটে। তারা এর বেশী খাটবে না। যদি তুমি তাদের বল, কিছু হাতে রাখছ না, কালকের হবে কি? যদি মেঘ জল না দেয়, যদি দুর্ভিক্ষ আসে, তোমার কিছু সম্বল আছে কি? একটু বেশী খাটনা ভাই, কিছু সংস্থান কর, পুঁজি কর, দুর্দ্দিনের সম্বল রাখ। কিন্তু তার চিন্তা নাই, জ্ঞান নাই, পরিশ্রমে তার প্রবৃত্তি নাই, আলস্যের জড়তায় সে অভিভূত! সে যদি ঈশার কথা জানতো, তবে সে হয়তো বিজ্ঞের মত তোমাকে উত্তর করতো, আমি ঈশার কথা অনুসরণ করে চ'লছি, আমি কালকের ভাবনা ভাবি না।

যথেচ্ছাচারী, অমিতব্যয়ী নবাব। কত তাঁর আয়, কত বিপুল সম্পত্তি! কিন্তু যে দিন তাঁর মৃত্যু হ'ল দেখা গেল, কত তাঁর ঋণ! কেন? ঐ নিশ্চেষ্টতাই তার মূল, তিনি কল্যকার কথা ভাবেন নি। তিনি ভাবতেন, নবাব আমি, অতুল বিত্তের অধিকারী আমি, আজ তো আমি খরচ করি, কাল কি হবে সে ভাবনা কেন? সেই নবাব বলতে পারতেন—ঈশার কথা মেনে চ'লছি আমি।

বঙ্গদেশের কৃষকদের মধ্যে অদৃষ্টবাদী অসংখ্য। যদি মেঘ বারিবর্ষণ করে, তবে আসবে লক্ষ্মীর শ্রী, ধন, ধান্য, স্বচ্ছলতা। আর যদি মেঘ

হ'তে বৃষ্টিপাত না হয়—তুমি কি ক'রবে বল? সবই যে অদৃষ্ট! লক্ষ্মী আসেন অদৃষ্টের গুণে, রোগ শোকও তাই। ঈশা বলেছেন—"তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি চিন্তা ক'রে ভেবে আপনার শরীরের দীর্ঘতাকে এক হাত বাড়াতে পার?" যদি এই কৃষকেরা ঈশার এই কথা জানতো তবে তা'রা বলতে পারত, আমরা ঈশার আজ্ঞা পালন করছি, ভেবে কি হ'তে পারে? যন্ত্রণা বাড়িয়ে কি লাভ? কপালে যা লেখা আছে, তা ঘটবেই ঘটবে, বৃথা ভাবনা।

তারপর সন্ন্যাসী, গৃহত্যাগী যিনি, তাঁর আর ভাবনা কি শরীরের? ভৈক্ষ্য নিয়েছেন তিনি, তাঁর পরিশ্রম কি জন্য? তিনি জানেন যদি কখনও গৃহস্থ সংসারী তাঁর অভাব দূর করে তবেই তাঁর অভাব দূর হবে, সন্ন্যাসীর ভাবনার কিছুই নাই। উদাসীনতাই যে তাঁর জীবনের ব্রত!

নববিধানের যুবক বন্ধু—তুমি কি করবে? তুমি ঐ চার শ্রেণীর কোন শ্রেণীরই লোক নও, তুমি অদৃষ্টবাদী কৃষক নও, অবিমৃষ্যকারী নবাব নও, নিশ্চেষ্ট অলস নও, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নও—তবে তুমি কেমন ক'রে বলবে, কল্যকার জন্য ভাবিও না? তুমি সন্ন্যাসী হ'তে পার না। এ সময়ের লোক হ'য়ে কখনও তুমি ও রকমের বিরক্ত সন্ন্যাসী হ'তে পার না। লৌকিক ভাষায় যাকে পরিবার বলে, সে পরিবার তোমার না থাকতে পারে, তা হ'লেও তুমি উদাসীন সন্ন্যাসী হ'তে পার না। তোমাদের মধ্যে যাঁর নিজের পরিবার নাই তাঁর পরিবার যে আরো বিশাল! লৌকিক গৃহী দু'চারটী পুত্র কন্যার কথা ভাবেন, আর তুমি ভাবছ কত সন্তানের কথা। তুমি কি প্রাণের সঙ্গে সায় দিয়ে ব'লতে পার এই কথা—কল্যকার জন্য ভাবিও না? তোমাকে ভাবতেই হবে। তুমি যে ভাবছ কত দুঃখী, রোগী, নিরাশ্রয়, দীনহীনের জন্য! অন্যে শুধু দিনে ভাবে, তুমি দিনে ভাব, রাত্রে ভাব। উদাসীন সন্ন্যাসী তুমি হ'তে পার না এই বিধানে।

তবে ব'লবে কেমন করে, ভাবব না? কি বল্লেন ঈশা? স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর কিছুর জন্য ভেবো না। রোগী রোগ যন্ত্রণায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে, তার কথা ভাবব না? তবে কি, না ভেবেই রোগীর পথ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে? রোগীর ভাবনা ভাববো না? চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো না? ঈশা কি এই অর্থে বলেছিলেন, আর কিছুর জন্য ভেবো না? না, না, সে শিক্ষা ঈশার নয়। কিন্তু ঈশার কথার অর্থ পরে ভাবলে চলবে, আগে ভাব কোন্‌টা ঠিক?—ভগবান কি বলছেন? ভাববে, কি ভাববে না?

যুবক বন্ধুগণ, "ভেবো না"—এ কথা তুমি কা'কে ব'লবে? সংসারে ভাবাই যে সব। চিন্তা, চিন্তা, চিন্তাই সব যে! চিন্তা ছাড়া কি হয়? চারিদিক হ'তেই আহ্বান আসছে, ভাবো, ভাবো! দেখ ঐ বিজ্ঞানবিদ্, ঐ ধার্ম্মিক, তাঁরা সংসারের অভাব মোচনের জন্য কত ভাবছেন। চিন্তার স্রোত চারিদিকেই ছুটে চ'লেছে অশ্রান্ত ধারায়। না ভেবে কোন্ অভাবের মোচন হয়? কি অপার চিন্তাসাগরে ডুবে আছেন ঐ বৈজ্ঞানিক। দিনে, রাত্রে একদণ্ড তাঁর বিশ্রাম নাই। সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান। কঠোর তপস্বীর মত তত্ত্বের রহস্যমাঝে তিনি সমাধিমগ্ন! তারপর হঠাৎ এক সুপ্রভাতে স্বর্গের কনক কিরণ তাঁর নিষ্ঠাসংযত হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন তিনি—"পেয়েছি, পেয়েছি" ব'লে আনন্দে উন্মত্ত হন। এই চিন্তার তন্ময়তা ভিন্ন কখনও কোনও গভীর সমস্যার পূরণ হ'তে পারে না, কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হ'তে পারে না।

তবে কি রকমের হবে এই চিন্তা? ঈশার কথা ভাব—প্রথমে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর। অন্বেষণ কর—কোথায় করবে অন্বেষণ? কি রকমে? স্বর্গরাজ্য কি কোন অজ্ঞাত প্রদেশে প্রচ্ছন্ন আছে—তাকেই খুঁজে বার করতে হবে? কলম্বাস যেমন আমেরিকা বার করেছিলেন একি সেই রকমের আবিষ্কার? অথবা জ্যোতিষী যেমন গণনা ক'রে

বুঝলেন আকাশের অমুক স্থানে অমুক সময়ে একটী গ্রহ থাকবে। তার পর তিনি দূরবীক্ষণ নিয়ে নিদ্রাহীন নেত্রে রাত্রির পর রাত্রি অনন্ত নভোমণ্ডলের অসীম শূন্যে তাঁর সেই ঈপ্সিত বস্তুটীর অন্বেষণে নিরত হলেন। তারপর যে দিন অকূল আকাশ সমুদ্রের মধ্যে একখানি ছোট্ট পালতোলা তরণীর মত তাঁর সেই কঠোর সাধনের ধন তাঁর দৃষ্টির পরিধিসীমায় প্রবেশ করলে সে দিন তিনি "পেয়েছি পেয়েছি" ব'লে আনন্দে অধীর হ'লেন। এই রকম ক'রে কি স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ? স্বর্গরাজ্য কোথায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তুমি ধ্যানযোগে দূরবীণ নিয়ে তার প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে থাক, একদিন পালতোলা তরণীর মত সে তোমার দৃষ্টি পথে উপস্থিত হবে। এই কি অন্বেষণ? স্বর্গরাজ্য কি একটী আবরণের পশ্চাতে লুকানো আছে, আবরণ উঠে গেলে তুমি দেখবে? এরই নাম স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করা? না, না, তা নয়। স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করার অর্থ স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করা, স্বর্গরাজ্য গঠন করা। এ আবরণ সরিয়ে দেখা নয়, গুপ্তকে আবিষ্কার করা নয়, এ গঠনের কথা। কি দিয়ে গঠন করবে? তোমাদের জীবন মন প্রাণ দিয়ে এই স্বর্গরাজ্যকে গড়তে হবে। ঈশা বলেন নি কোথাও, কোন সুদূর পরলোকে সুন্দর স্বর্গ তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে, তোমরা তাকে খুঁজে বার কর। তিনি বলেছিলেন—জীবন মন প্রাণ দিয়ে স্বর্গ গঠন কর।

এ গঠন কার্য্যের উপকরণ কি? এখানে প্রথম কর্ত্তব্য—জীবন দান। তার পিছনে চিন্তা। চিন্তা না হ'লে কিছুই হবে না, কেমন ক'রে বুঝবে স্বর্গরাজ্য কি ক'রে গড়তে হ'বে? কোটী জীবন মিশিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষকে, দেশের সঙ্গে দেশকে, জাতির সঙ্গে জাতিকে মিশিয়ে স্বর্গরাজ্য গড়তে হয়—চিন্তা না থাকলে এ কথা কি ক'রে বুঝবে? ঈশার কথার প্রকৃত অর্থ কল্যকার জন্য দিন, রাত ভাববে—

এ ভাবনায় জীবন দিতে হবে। সে ভাবনা কি রকমের? ঐ যে ঈশা বল্লেন—পদ্মের দিকে চেয়ে দেখ; দেখ, পদ্ম কি খোঁজে, কা'কে অন্বেষণ করে? তার ভিতরে জীবনীশক্তি আছে, সে আপনাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে; আমরা বলবো তার ভিতরে চিন্তা নাই। এতো আমাদের মোটা দৃষ্টির মোটা কথা। সূক্ষ্মদর্শী কবি বৈজ্ঞানিক বলেন—তার ক্ষুদ্র জীবনের মূলে গোপনে নিভৃত বিশ্বচিন্তা তার মধ্য থেকে তার জীবনকে ফুটিয়ে তুলছে। কাণ্ডের সঙ্গে শাখার, শাখার সঙ্গে পাতার, মূলের সঙ্গে সরোবরের, কত রকমের যোগ সম্বন্ধ স্থাপিত করেছে! একটী অখণ্ড জীবনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে তার জীবনের মধ্য দিয়ে। আর এই জীবনের স্রোত যত সতেজ হয়ে বইছে, ততই সে মৃণালে, কোরকে, দলে, শীর্ষে বিকশিত হ'য়ে উঠছে। তার জীবন খুঁজছে পূর্ণতা, এই পূর্ণতা খুঁজতে গিয়ে সে সম্বন্ধ পাতিয়েছে এত জিনিষের সঙ্গে! কিন্তু সে কি জানত কেমন করে তার মধ্যে বিচিত্র রং ফলবে; কেমন ক'রে সূর্য্যের সোণার রং এসে তার বুকে এসে পড়ে তার প্রাণটীকে সাজাবে। সে ভাবনা সে ভাবে নি, সে সুখ বিলাস চায় নি, সে জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছিল। তারপর, সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, সরোবর, সমীর আপনাদের মাধুরীরাশি দিয়ে তার শোভাকে বিচিত্র মধুময় ক'রে দিলে।

ঈশাও তাই বল্লেন—প্রথমে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর। প্রথমে দেখ ভগবান পিতা, নরনারী ভাইবোন। জীবনের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন কর, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকো না। ইহুদি চিহ্নিত জাতি, আর সব Gentiles অভিশপ্তজাতি? তারা চিরদিন আঁধারে ডুবে থাকবে? এমন সর্ব্বনাশের, নরকের কথা ভোল। স্বর্গরাজ্যে Jews ও Gentiles এর পার্থক্য নাই, সেখানে সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। পবিত্র হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালবাস, স্বর্গের প্রতিষ্ঠা কর, প্রেমে সব এক দেখ,

বিশ্বসংসার এক সুত্রে গাঁথা এ সত্য অনুভব কর। এর জন্য জীবন দাও, তারপর দেখবে—all these things shall be added unto you—স্বর্গ চাইলে অন্য সব জিনিষ আপনা হ'তে এসে জুটবে—ঠিক যেমন পদ্মের জীবনে শোভা সংযোজিত হয় তেমনি অন্য সব জিনিষ তোমাকে দেওয়া হবে। পদ্মের শোভা চিত্রকর তুলি ধরে আঁকে না—প্রকৃতির নিয়মে তার মধ্যে বর্ণের বিচিত্রতা আসে। সে শোভার জন্য ব'সে ব'সে ভাবে নি—প্রকৃতির নিয়মে সে শোভা আপনা আপনি তার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। ছোট স্বার্থপরতা ভুলে যাও; Jew, Gentiles ভুলে যাও; চিহ্নিত বর্জ্জিত এ পার্থক্য ভোল। সকলকে বঞ্চিত ক'রে নিজে সুখ পেতে চাও?—এমন নীচ সঙ্কীর্ণতাকে বিসর্জ্জন দাও, সকলকে ভালবাস, প্রেমে সকলকে এক কর। তা হ'লে দেখবে বাণিজ্য ললিতকলা, শোভা সম্পদ বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপে আপনি ফুটে উঠবে। এরই নাম কল্যকার জন্য ভেবো না,—সমস্ত জীবন দিয়ে ভাববে,—কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নয়, বিশ্বমানবের মঙ্গল কামনায়।

কিন্তু জীবন দেবে কি ক'রে? স্বর্গ প্রতিষ্ঠা ক'রবে কিরূপে? ঈশার কথার এত আদর কেন? তিনি প্যালেষ্টাইনে যে কথা ব'লে গেলেন—আজ বিশ শতাব্দী পরে তার এত গৌরব কেন? জগত আজও এ আদর্শ ভুলতে পারে নি—এ শুধু মতের কথা নয়। রাজা রামমোহন বল্লেন—ঈশার ধর্ম্ম না পেলে পরিত্রান নাই। কেশব বল্লেন—ঈশার ভিতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলন হবে। তাঁরা কি না ভেবে এই সব কথা ব'লেছেন? সে রকমের লোক তো তাঁরা ছিলেন না। ভাব, কত বড় কথা ঈশার—স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর সব জিনিষ তোমাদের দেওয়া হবে। আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতা অনেক রকমের হ'য়ে গেছে, কিন্তু এ দেশে এ কথা হয় নি। শঙ্করাচার্য্য কি বল্লেন?

তিনি ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতে ব্যবধান রাখলেন। অবশ্য তিনি একথা ব'লেছেন যে ব্যবহারিক জগত আত্যন্তিকভাবে মিথ্যা নয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, ললিতকলা—এ সব ব্যবহারিক। যত শীঘ্র পার এদের মায়া ভুলে পারমার্থিক সত্যে প্রবেশ কর। তার পর শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। তিনি উদাসীন, প্রেমিক সন্ন্যাসী, তিনি জগত ছাড়লেন। সুন্দরের প্রেমে মজলেন, ডুবলেন, আর ফিরলেন না। এই কি মানব জীবনের আদর্শ? তার পর বুদ্ধদেব। বোধিদ্রুমের তলে মার এসে তাঁকে বল্লে—"তুমি এখন সিদ্ধিলাভ ক'রেছ—এখন বিশ্রাম কর।" সিদ্ধার্থ বল্লেন, "না রে দুরাত্মন্ মার, আমি যে তত্ত্ব পেয়েছি তা আমি সকলকে দেব, ব্যথিত মানবকে পরিত্রাণের পথ দেখাব। দুঃখময় জীবনে পরিত্রাণ পেয়ে কিরূপে শান্তিলাভ করা যায়, সে মন্ত্র সকলকে শোনাব।" তাই তিনি প্রচারের ব্রত নিলেন। কিন্তু কি প্রচার করলেন?—দুঃখের জীবন হ'তে মোক্ষলাভ। স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য তাঁর প্রচার নয়। হৃদয়ে হৃদয়ে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে মিলে কেমন ক'রে স্বর্গ গঠিত হয়, সে কথা প্রচার তিনি করেন নি। প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবন কিরূপে বাসনা ছেড়ে, জরা মরণের হাত এড়িয়ে নির্ব্বাণলাভ ক'রতে পারে, তাই প্রচার ক'রতে তিনি সচেষ্ট হ'লেন, এই আমাদের ভারতের শিক্ষা।

অন্য দিকে ঈশার কি শিক্ষা ভেবে দেখ। "স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তোমাদের আসবে।" তিনি জীবনের সমগ্রতাকে স্বীকার ক'রেছেন, অন্তর বাহির সব নিয়ে তাঁর শিক্ষা। স্বর্গরাজ্য প্রধান, কিন্তু শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা, উন্নতি, এ সকলকে আনুসঙ্গিকভাবে স্বীকার করা হ'য়েছে, তারা আপনা হ'তে আসবে, যেমন পদ্মের শোভা আপনা হ'তে আসে পদ্মে। অনেক ভুল ব্যাখ্যা, অনেক মতদ্বৈধের ভিতর দিয়ে জগত চলেছে এই মহান আদর্শ লাভের পথে।

এখন এ যুগে কেউ আর সেই Monastic ordersএর ব্যাখা, Crusadesএর ব্যাখা, Puritanদের ব্যাখা বা কঠোর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের ব্যাখ্যা নেবে না। কিন্তু তা না নিলেও এই বিংশ শতাব্দীতে তার সমুন্নত বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতার আলোক নিয়ে ব'লতে হবে, "Seek ye first the kingdom of God......and all these things shall be added unto you" এই স্বর্গরাজ্য বর্ত্তমান শতাব্দী গভীরতরভাবে চায়—পূর্ণভাবে চায়। স্বর্গরাজ্যকে প্রথম চাই, আর সব আনুসঙ্গিক ভাবে আসবে।

যুবক বন্ধু, আগে তুমি স্বর্গরাজ্য চাও। এর কত গূঢ় তত্ত্ব একদিনে কত ব'লব? মানব সমাজের ভিত্তি কোথায়? মানুষের সমাজ সেবার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমাজ অর্থ—পরস্পরের সেবা। টাকা-কড়ি, বিধি-ব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য, এ সব অবান্তর, বাইরের আকার মাত্র, মূল-কথা সেবা। যদি Robinson Crusœর মত একাকী বন্য পশুর মত থাকতে চাও, সে আলাদা কথা; কিন্তু যদি মানুষ হ'তে চাও, তবে জীবন মন প্রাণ দিয়ে সেবা ক'রতে হবে। কৃষক ক্ষেত্রে পরিশ্রম করে—কেন? সে মনে করে সে আপনার জন্য খাটছে, টাকা পাবে, সংসারের খরচ চালাবে। কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, সে কি ক'রছে। সে সেবা ক'রছে, সে ক্ষুধিতকে অন্ন দিচ্ছে। হায়! এ কথা সে জানে না কেন! জানে না—তাই সে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করে নি, সে আহার অন্বেষণ ক'রছে। তার চোখ খুল্‌লে সে বুঝতো মাথার উপর সে কেন রৌদ্র বৃষ্টির পীড়ন সহ্য ক'রছে। সে যে নিজের সেবা দিয়ে অনাহারীকে অন্নদান ক'রছে। টাকা-কড়ি কি? সমাজ তার সেবার বদলে তাকে সেবা ক'রছে। ঐ যে তাঁতি কাপড় দিলে, মজুর ঘর তৈরী করলে—তারাও তো সেবা পেয়ে সেবা দিলে। তাদের জ্ঞান থাকলে তারা বুঝতো যে তারা প্রথমে স্বর্গরাজ্যকেই চাইলে—খাওয়া পরা তাদের জুটে গেল।

যুবক বন্ধু, তুমি কেমন ক'রে সেবা ক'রবে? আইন ব্যবসায়ী তুমি? অনেক টাকা পাবে ব'লে ঐ কাজ নিয়েছ? না, না, তুমিও সেবার ব্রত নিয়েছ। পৃথিবীতে সদ্বিচার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, অবিচার যাতে না হয়, তাই তোমার লক্ষ্য। ভেবে দেখ কত বড় মহৎ তোমার সেবা। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সত্যকে সাক্ষী ক'রে যদি এই সেবা দিতে পার, দেখবে সমাজ তোমাকে এর বদলে কত সেবা দিতে প্রস্তুত। যদি জীবনে জীবনে এই রকমের সম্বন্ধ হয় তবে দেখবে যে তুমি প্রথমে স্বর্গ চেয়েছ, আহার তোমার জুটে গেছে।

যুবকগণ, তোমাদের জীবনের এই আরম্ভ—ভাব, কি ক'রে স্বর্গরাজ্য গঠন কর'বে। কোন্ আকারে সেবা দেবে? ভগবানের আলোকে তাঁরই আদর্শে, সংসারের যথার্থ অভাব মোচনের জন্য যে চেষ্টা তারই নাম সেবা। যার যা দরকার নাই তাকে তা দিলে সেবা করা হয় না। এতে দিব্যজ্ঞান চাই, ঠিক জিনিষটী দেওয়া চাই। রোগীকে পরমান্ন দিলে কি ফল? তুমি জগৎকে কবিতা দেবে? তুমি বাল্মীকি হবে, যদি অমৃত থাকে তোমার কবিতায়; আর যদি তাতে অমৃতের আস্বাদন না থাকে তবে দূষিত কল্পনার সাহায্যে তুমি জগতের মধ্যে পাপের বিষ—মৃত্যুর বীজ ছড়াবে। এখানে অভাব বোধ চাই, দিব্য-জ্ঞান চাই, শক্তি চাই তবে সেবা হবে। সেবা করতে গিয়ে দেখি, জ্ঞান নাই আমার, অথবা স্বার্থপর আমি। সেবা করতে হ'লে এক দিকে কোমলতা চাই, অন্যদিকে বিশুদ্ধ জ্ঞান চাই। মানব সমাজে এই সেবা নিয়েই সকল লোক চলেছে। শিল্পী, রাজনীতিবিদ্, শান্তিরক্ষক সবাই করছে সেবা। তাই ঈশা বল্লেন—সেবার উপরেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ কথা বোঝে ক'জন? সেই বিশ্বাস, জ্ঞান, শক্তি কোথায়? সেবার উপর ভগবানের প্রেম, তার উপরে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব, এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস নিয়ে মানুষ যদি সেবা করে তবেই স্বর্গরাজ্য গঠিত

হয়। দিব্য জ্ঞান, দিব্য প্রেম, অটল বিশ্বাস, এ থাকলে অন্য কোন জিনিষের অভাব থাকে না; এ থাকলে জীবনের সকল কাজ পবিত্র, সুন্দর, উজ্জ্বল হয়, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হে যুবক বন্ধু—সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, জীবন পূর্ণ হবে, মধুময় হবে, বিচিত্র শোভায় সার্থক হবে।

দ্যৌঃ পিতা নোঽসি।*

প্রিয় শিশুমণ্ডলী, আজ তোমাদের এই শুভসম্মিলনে কত আনন্দ—এতে তোমাদের কত শেখবার আছে। আজ তোমাদের আমি একটী শিক্ষা দিব—সেইটী তোমাদের সকলকে শিখতে হবে—সকলকে মনে করে রাখতে হবে। সেটী এই—"পিতা নোঽসি।" এইটী মনে ক'রে রাখ। নোঽসি অর্থাৎ নঃ অসি—এর মানে—তুমি আমাদের পিতা।

কোথায় এটী আছে জান? ভারতবর্ষের ঋষিরা যখন বেদ রচনা করেন—যখন বেদান্ত তৈরি করেন—তখন তাঁরা বলেছিলেন এই কথা। সে আজ কত বৎসর হ'ল! কিন্তু এখনও সেই আর্য্য ঋষিদের সন্তান আমরা—আমরাও এই কথা ব'লে ভগবানের পূজা করি। ভাব, সেই সিন্ধুনদ কোথায়—কোথায় তার শাখা উপশাখা—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু; বিতস্তা, বিপাশা! সেই পঞ্চনদের দেশে আর্য্যেরা উপনিবেশ স্থাপন ক'রলেন। সেখানকার প্রকৃতির মধুময় সৌন্দর্য্যে তাঁদের হৃদয় মন মুগ্ধ হয়ে গেল। তাঁরা প্রকৃতির নানা রূপের উপাসনা ক'রলেন—তাঁদের দেবতা হ'লেন—সবিতা, উষা, বরুণ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি। শেষে

* ২৪শে জানুয়ারী ১৯১২, দ্বাশীতিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগের প্রতি উপদেশ।

তাঁরা প্রকৃতিকে ছেড়ে প্রকৃতির দেবতাকে পূজা করলেন। তখন তাঁরা সেই দেবতাকে বল্লেন—"পিতা নোঽসি।" কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী কথা বল্লেন—"দ্যোঃ পিতা নোঽসি।" পৃথিবীর পিতামাতাকে সকলেই জানি—কিন্তু তুমি পৃথিবীর পিতামাতারও পিতা—দ্যোঃ পিতা —তুমি আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। দ্যোঃ পিতা নোঽসি—এই বাক্যটী তোমরা সকলেই মনে রেখো।

সেই কত যুগ পূর্ব্বে ঋষিরা এই কথা ব'লে ভগবানের পূজা করেছিলেন—তোমরাও এখন সেই কথা বলেই ভগবানের পূজা কর। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে ব'লো—স্বর্গস্থ পিতা, তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সকল বিপদে উদ্ধার পাই—তোমার সুসন্তান হই—যেন সকলকে ভালবাসি। আর যখন রাত্রে ঘুমুতে যাবে তখন দু'টী হাত যোড় ক'রে সেই দেবতাকে ব'লো—দ্যোঃ পিতা নোঽসি। স্বর্গস্থ পিতা, তুমি আমাদের সব বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রেছ—তুমি আমাদের ভালবাস—সেইজন্য তোমার চরণে নমস্কার করি। আমরা যখন ঘুমুবো তখন আমাদের সব বিপদ হ'তে রক্ষা করো—তুমি বিছানার পাশে, মাথার কাছে থেকো—তোমার চোখ আমাদের মুখের উপর রেখো—দ্যোঃ পিতা নোঽসি।

আমরা ভারতবর্ষের লোক এই কথা ব'লে ভগবানের পূজা করছি। তোমরা ঈশার কথা পড়েছ? ঈশা প্যালেষ্টাইনে জর্ডন নদীর তীরে আপনার শিষ্যেদের কি শিক্ষা দিলেন জান? তিনি উপাসনার এই মন্ত্র দিলেন—Our Father which art in Heaven—আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। ঈশা বেদ পড়েন নি; কিন্তু সেই পঞ্চনদের তীরে ঋষিরা যে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, ঈশাও জর্ডনের তীরে ঠিক সেই মন্ত্রের কথাই বল্লেন! কতদিন হ'য়ে গেল ঈশা এই পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—শিষ্যদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন—কিন্তু আজ যদি তোমরা কোন

গির্জ্জায় যাও, দেখবে সবাই সমস্বরে এই কথা উচ্চারণ ক'রে দেবতার পূজা ক'রছেন। পৃথিবীতে কত খৃষ্টান-দেশ আছে—কত বড় বড় গির্জ্জা আছে—কিন্তু সর্ব্বত্রই খৃষ্টানগণ এই একই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ভগবানের কাছে প্রর্থনা করছেন।

তোমাদের আর একটা কথা বলি। যখন তোমরা বলবে—দ্যৌঃ পিতা নোঽসি, তখন তোমরা স্মরণ ক'রো যে আমরা যেমন এই কথা বলছি তেমনি সকলেই এই কথা বলে ভগবানের পূজা ক'রছেন। এইটী মনে রেখে এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রলে আমরা দেখতে পাই—এই জগতের সবাই আমাদের ভাই বোন। আমরা দেখতে পাই যে এই বিশাল বিশ্ব-আকাশতলে, বিশ্বের মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকল লোক একপ্রাণে মিলিত হ'য়ে সেই মহান্ বিশ্বেশ্বরের বন্দনা গান ক'রছে—"দ্যৌঃ পিতা নোঽসি।" এ শিখলে শুধু ঈশ্বরকে পিতা নয়—কিন্তু জগতের সকল নরনারীকে ভাইবোন ব'লে জানবে—জীবন উন্নত হবে।

এখন এই বাক্যটীর অর্থ সম্বন্ধে তোমাদের দু'চারিটী কথা ব'লব। "স্বর্গস্থ পিতা"—এর মানে কি? ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই—তিনি আমাদের পিতা, আমরা সকলে তাঁর সন্তান। কিন্তু সন্তান বল্লে কি বোঝায়? প্রথমতঃ এই বোঝায় যে তাঁর যে প্রকৃতি—আমাদেরও সেই প্রকৃতি; সন্তান পিতার প্রকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ এই বোঝায় যে তিনি আমাদের পিতা তাই তিনি আমাদের ভালবাসেন। তৃতীয়তঃ বোঝায় যে তিনি পিতা তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি আমাদের শাসন করেন।

(১) তাঁর প্রকৃতি—কি রকম? প্রকৃতি এক হওয়া মানে তিনি যেমন মহান্, গৌরবান্বিত—নীচতা পরিশূন্য, আমরাও সেই রকম। আমরা সকলেই দেবপুত্র—দেবকন্যা। বড় লোকের ছেলে মেয়েই হও, আর দীন দুঃখীর ছেলে মেয়েই হও—পোষাক পরিচ্ছদ তোমাদের

যেমনই হোক্—তোমরা মনে রেখো তোমরা দেবপুত্র—দেবকন্যা। বাইরের পোষাক দিয়ে নিজেদের বিচার ক'রো না—পোষাকের দীনতায় তোমরা কখনও দীন বা নীচ হবে না। তোমরা সেই রাজপুত্রের গল্পটী কি জান? একবার এক রাজপুত্রের ইচ্ছা হ'ল যে চাকরের সঙ্গে পোষাক বদল করে তিনি বেড়াতে বেরুবেন। তিনি নিজের রাজপরিচ্ছদ ভৃত্যকে পরিয়ে দিলেন—আর নিজে পরলেন সেই চাকরের পোষাক। এই ভাবে বেড়াতে বেরুলেন। রাস্তায় যত লোক তাঁদের দেখে তারা ভাবে একি অদ্ভুত! যে রাজার পোষাক পরে আছে তার ব্যবহার কি নীচ! আর যে চাকরের পোষাক পরে আছে তার স্বভাব কেমন কোমল—তার ব্যবহার কেমন ভদ্র—তার কথাবার্ত্তা কেমন সুমিষ্ট। কই পরিচ্ছদ তো প্রকৃতিকে ঢাকতে পারল না। প্রকৃতি পোষাকের আবরণ ভেদ ক'রে যে ফুটে বেরুল! কিন্তু তোমরা শুধু রাজপুত্র, রাজকন্যা নও—তার চেয়েও অনেক বেশী—তোমরা দেবপুত্র, দেবকন্যা। তোমাদের ব্যবহার সুমিষ্ট হবে—দেবসন্তানের উপযুক্ত হবে।

আর একটী গল্প বলি। এটী এক কুৎসিৎ রাজহংসশাবকের গল্প। একবার একটী রাজহংসশাবক পাতিহাঁসের দলে এসে পড়েছিল। সেই ছানাটী দেখিতে কুৎসিৎ—সেই জন্য তাকে কত নির্য্যাতন ভোগ ক'রতে হ'ল। পাতিহাঁসরা তাকে অনেক জ্বালাতন ক'রে শেষে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে। সে ভাবলে হায়! আমার কি দুরবস্থা! সে সদাই মনের দুঃখে থাকে—তার আর কিছুতেই সুখ নাই। তারপর সে ক্রমশঃ বড় হ'য়ে উঠলো। তারপর একদিন নির্ম্মল প্রভাতে যখন সে সরোবরের স্বচ্ছ জলে সাঁতার দিতে গেল—তখন সেই নির্ম্মল জলে আপনার শরীরের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলে—কি সুন্দর, কি মনোহর! সে দিন সে আপনাকে চিন্‌লে—তার সব দুঃখ দূর হ'য়ে

গেল। সেইরকম আমিও বলি তোমরা বাইরের পোষাকে দুঃখিত হ'য়ো না—আপনার ভেতরকার প্রকৃতিটীকে ফুটিয়ে তোল—তখন দেখবে তোমরা দেবসন্তান, তোমাদের মধ্যে সুন্দর দেব চরিত্র!

আর একটী উদাহরণ দিই! প্রজাপতির ডিম দেখেছ? দেখতে কিছুই না—তাতে কোন চাকচিক্য নাই। তারপর ডিম ফুটে যখন শুঁয়ো পোকা বেরুল—তখন কি কুৎসিৎ সে দেখতে! পায়ের কাছে এলে লোকে তাকে ঘৃণায় দূরে ফেলে দেয়। কিন্তু তারপর,—দিন আসে যে দিন সে মনোমোহন প্রজাপতি রূপ ধারণ করে, রামধনুর রঙে আঁকা তার বিচিত্র কোমল পাখা দু'টী বিস্তার ক'রে, আনন্দে ফুল হ'তে ফুলে—শোভা হ'তে শোভার মধ্যে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। তাই আবার ব'লছি—বাইরের রূপে দ'মো না,—তোমাদের ভেতরের দেব প্রকৃতি ফোটাও, দেখবে কি বিচিত্র সুন্দর রূপ হবে তোমাদের।

(২) তিনি ভালবাসেন। পৃথিবীর পিতামাতা যেমন তেম্‌নি? না তাঁদের হ'তেও বেশী। ধ্রুবের গল্প মনে কর। এমন হয় যে, যে কোন কারণেই হোক্ পিতা পুত্রকে ভালবাসেন না। ধ্রুব পিতার কোলে উঠতে চায়—পিতা তাকে কোল দিলেন না, পিতা তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। তখন দুঃখিত বালক ধ্রুব কি চাইলে? মায়ের কাছে দুঃখ জানিয়ে, মায়ের পরামর্শ নিয়ে ধ্রুব বনে গেল। কাকে খুঁজতে? সেই স্বর্গস্থ পিতাকে। যখন পৃথিবীর পিতা তাকে স্নেহ দিলেন না, তখন সে স্বর্গের পিতার স্নেহ লাভ ক'রতে বনে বনে ঘুরতে লাগল। একথা তোমরা ভাল ক'রে মনে রেখো—যদি সংসারে আমাদের কেউ না ভালবাসে, সেই স্বর্গস্থ পিতার ভালবাসা কখনও চ'লে যায় না—যদি পৃথিবীর পিতা কোল দিতে বিমুখ হন, সেই স্বর্গের পিতা তাঁর কোন সন্তানকে কখনও তাঁর স্নেহের কোল হ'তে নামান না। তিনি আমাদের ভালবাসেন।

(৩) তিনি শাসন করেন। পিতার ভালবাসা কখনও পুত্রকে দূষিত করে না। যদি আমরা কোন নীচ কাজ কর্‌তে যাই—অমনি তিনি আমাদের সাবধান করেন। তাতেও যদি না শুনি—তিনি আমাদের শাসন করেন। যদি তোমরা পিতার এই শাসন মানো—তাঁর কথা শুনে চলো—তা হ'লে মঙ্গল হবে। তা হ'লে তোমরা পবিত্র, নির্ম্মল, সুন্দর হবে।

পিতা আমাদের ভালবাসেন—কিন্তু এই সঙ্গে আমাদেরও পিতার প্রতি কর্ত্তব্য আছে। পিতার ভালবাসা পাওয়া উচ্চ অধিকার—কিন্তু এ উচ্চ অধিকার ভোগ ক'রতে হ'লে মাথায় দায়িত্বের বোঝা নিতে হবে। যেখানে কোন দায়িত্ব নাই সেখানে কোন উচ্চ অধিকারও নাই। আমাদের কি দায়িত্ব? তাঁর বাধ্য হয়ে চলা—তাঁর ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে সব কাজ করা। তিনি আমাদের ভালবাসেন—আমরাও যেন তাঁকে প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসি, তাঁর সুসন্তান হই। আমরা যেন কায়মনোবাক্যে তাঁর প্রকৃতিকে আমাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারি। তিনি স্বর্গস্থ পিতা—তোমরা অবনত মস্তকে তাঁর শাসন মেনে নেবে। মঙ্গলময় তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন—তিনি তোমাদের সুন্দর করুন—তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা তোমরা জীবনে পূর্ণ কর।

ওঁ দ্যৌঃ পিতা নোঽসি।

বিস্মৃতির দুর্গতি।*

এই যে উপদেশে (আচার্য্যদেবের উপদেশ—ব্রহ্মের সন্তানত্ব) ভুলে যাওয়ার কথা শুনলাম, সেই ভুলে যাওয়া জিনিসটা সকলে ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। কেন ভোলে মানুষ? তরুলতা যেমন একবার সজীব

*৭ই মে, ১৯১১, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত উপদেশের সারসংগ্রহ।

মনোরম ফলে ফুলে শোভান্বিত হয়ে ওঠে, অন্য সময়ে, শুষ্কতার মধ্যে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে—মানুষের ভুলে যাওয়াও তো তাই। জীবন নিয়ে, চৈতন্য নিয়েই মানুষ—চেতনার স্পন্দন যেখানে নাই, সেখানে মনুষ্যত্ব কোথায়? যতটুকু স্মৃতি জাগরুক আছে, ততটুকুই আমি আছি—যা ভুলে গেছি সে যেন আমার অঙ্গহানি ঘটেছে—যেন হাত পা কাটা পড়েছে—যেন রক্ত শুকিয়ে গেছে। এই তো বিস্মৃতি! আমরা মানুষ, দেবতার সন্তান—সেই দেব-অধিকার নিয়েই আমাদের জন্ম। শুধু তাই নয়, সেই দেব-অধিকার আমরা সম্ভোগ ক'রলাম, প্রাণে তার মধুরত্ব, তার গৌরব উপলব্ধি ক'রলাম, তারপর যদি ভুলে যাই—ভুলে যাই সেই গৌরবজনক দেবসন্তানত্বের উচ্চ অধিকার—তা হ'লে জীবন শুষ্ক হ'ল—প্রাণ মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়াল। কেন ভোলে মানুষ? যদি এ কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখি, যদি হৃদয়কে এ বিষয় প্রশ্ন করি, যদি পরীক্ষা করি আপনাকে—এক দিন সুপ্রভাতে বুঝলাম আমি দেবসন্তান, উচ্চ অধিকার, উন্নত আদর্শ চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'ল, দেখলাম সেই উচ্চ আদর্শ, সেই সমুন্নত আশা, আকাঙ্ক্ষা সকলকে জাগ্রৎ রাখে—ঐ রকম জীবন চাই, এতটা জ্ঞানের, সত্যের, পুণ্যের, প্রেমের আদর্শ আমাকে গ্রহণ করতে হবে; আলস্য, পাপ, বিশৃঙ্খলা, অনিয়মকে দূর ক'রে, নীচতাকে পরিহার ক'রে ভাল হ'তে হবে; প্রত্যেক জীবন পুণ্যের জীবন, স্বাস্থ্যের জীবন, প্রেমের জীবন হ'য়ে ফুটে উঠবে—এই জীবন্ত আদর্শ দেখলাম, ছবি এবং শোভা দেখে মন মজলো—তারপর আবার ভুলি কেন? দেবসন্তান সেই উন্নত আদর্শ ভুলে কেন বলে—আমি মানুষ? না শুধু তাই নয়, বলে—আমি পশু। হীন পশুজীবন আলিঙ্গন ক'রে মানুষ কেন বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায়?

এই ভুলে যাওয়ার ভেতর কি পরীক্ষা, কি বিপদ, কি যে দুর্গতি তা যদি ভাল ক'রে বুঝতে পারি, তা হ'লে কি সতর্ক হ'তে পারব না?

যাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্র জানেন, তাঁরা অবগত আছেন যে, যার শরীর খুব সুস্থ এবং সবল সে যদি তীব্র বিষ পান করে তবে তার সেই সুস্থ শরীর তীব্র বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়—অসহ্য যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়—মৃত্যুর মধ্যে অচিরে তার জীবন মিশিয়ে যায়। বিষ তার শরীরে প্রবেশ করলে, বিষের সঙ্গে তার জীবনের তুমুল সংগ্রাম বাধে—সুস্থ রক্ত সেই বিষবিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—তাই তার সেই দুর্ব্বিসহ যাতনা—তাই তার সেই ব্যাকুল অস্থিরতা। শেষে হয়তো জীবন পরাস্ত হয়ে গেল—বিষ জয়লাভ ক'রে তাকে মৃত্যুর মাঝে টেনে নিলে।

কিন্তু আর এক রকমের বিষ প্রয়োগ আছে। একটু একটু ক'রে বিষ প্রয়োগ করতে করতে জীবন বিষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। বিষের সঙ্গে রক্তের পরিচয় হয়ে যায়—বিষের সঙ্গে শরীর সন্ধি স্থাপন করে। প্রথমে সংগ্রাম যে হয় না তা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে দেহ বিষ-সহিষ্ণুতা লাভ ক'রে বসে। বিষের সঙ্গে এই পরিচয় বা সন্ধির ফল—মৃত্যু নহে, কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থা। জীবন শীর্ণ হয়, রক্ত বিকৃত হয়, দেহ ক্ষীণ হয়—কিন্তু মানুষ মরে না। মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে—বিষ-সহিষ্ণুতা লাভ ক'রে—মানুষ জীবন্মৃত অবস্থায় নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে থাকে।

দেখুন কোন ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশ। সেখানকার লোক মরে নি—তাদের ঐ জীবন্মৃত অবস্থা। সে দেশে কোন সুস্থকায় সবল-শরীর লোক গেলে সে হয়তো মরে যাবে। হয় সে সেখানকার বিষের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে, তার উপরে জয়লাভ ক'রে, আপনার সতেজ সুস্থ ভাব জাগিয়ে রাখবে, না হয় সে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তার জন্যে হয় জীবন—না হয় মৃত্যু। এর মাঝামাঝি কোন অবস্থা নেই। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের কি অবস্থা?

তারা মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন ক'রে বসেছে—তারা জীবনে রুগ্ন শীর্ণ অবস্থাকে আলিঙ্গন ক'রে বিষের সঙ্গে সন্ধি ক'রে নিয়েছে। এ বড় শোচনীয় অবস্থা!

আধ্যাত্মিক জীবনেও ঐ জীবন্মৃত অবস্থা বড় ভয়ানক অবস্থা। এমন দুর্গতির অবস্থা আর কিছুই হ'তে পারে না। যদি কোন উন্নত চরিত্র এমন অবস্থায় পড়ে যেখানে চারিদিকের বাতাস শীতল, চারিদিকের আবেষ্টন সহানুভূতিশূন্য, চারিদিকে বিকার-ব্যাধির বিষাক্ত বায়ু, তা হ'লে সেই সতেজ আধ্যাত্মিক-রক্ত-পূর্ণ চরিত্র চারিদিকের অবস্থার সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এ সংগ্রামে হয় সে জয়লাভ করে, নয় সে প্রদীপ্ত তেজে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। কিন্তু এ ছাড়া আর এক রকমের দৃশ্য আছে। পুণ্যের জন্য প্রাণে কত আকাঙ্ক্ষা ছিল; পাপ ম্যালেরিয়া ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ ক'রে প্রাণকে জরাগ্রস্ত করে দিলে—সে উন্নত আকাঙ্ক্ষার অবসান হ'ল—মৃত্যুর সঙ্গে অল্পে অল্পে সদ্ভাব স্থাপিত হ'ল—বিষ সহ্য করবার সহিষ্ণুতা লাভ হ'ল—এর ফল হ'ল চিররুগ্ন অবস্থা—ঐ শোচনীয় জীবন্মৃত অবস্থা। এর চেয়ে কি ঐ পূর্ণ মৃত্যু শ্রেয়স্কর নয়—বেঁচে মরা অপেক্ষা পূর্ণ সাহসে কি মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়? জীবন্মৃত অবস্থা যে চরিত্রে, যে পরিবারে, যে সমাজে এসে পড়েছে সেদিকে তাকালে কার না প্রাণ কাঁদে? এই তো বিস্মৃতি—আপনার উচ্চ অধিকার ভুলে বিষের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন—মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি—অতি তুচ্ছ হীন পশু জীবনের ভারবহন! হে ব্রহ্মসন্তান, এই বিস্মৃতি—এই জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে তুমি থাকবে? যখন তোমার উচ্চ লক্ষ্য ছিল, উন্নত আদর্শ ছিল, তখনই যদি সংগ্রামে জীবন দিতে পারতে তবে সেই তো তোমার মঙ্গল ছিল। আর যদি অল্পে অল্পে বিস্মৃতির মধ্যে উচ্চ অধিকারের কথা, বরণীয় দেবত্বের কথা ভুলে, ভগবানের

সুমধুর আহ্বানের কথা ভুলে, জীর্ণ শীর্ণ জীবনভার বহন কর—তা হলে এমন শোচনীয় অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। হে সমাজ, তুমি যদি সজীব, সতেজ অবস্থা ভুলে জীবন্মৃত অবস্থাকে গৃহে ডেকে আন তবে তোমার দুর্গতির চরম অবস্থা হয়েছে বলতে হবে।

যে লোক এই বিস্মৃতির অবস্থায় এখনও কষ্ট অনুভব করে, তার ভেতরে এখনও জীবনের সাড় আছে; কিন্তু যার সে কষ্টবোধটুকুও নাই সে একেবারেই অসাড হ'য়ে পড়েছে। এ বিধাতার আশীর্ব্বাদ যে তিনি মোহের মধ্যে বজ্রবেদনে মানবের অসাড় প্রাণকে জাগিয়ে তোলেন, তাঁর হাতের দেওয়া যন্ত্রণা বিস্মৃতিকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রাণে শুভ আদর্শ ফুটিয়ে তোলে। তাঁর হাতের দেওয়া সে কষ্টকে আমরা মাথা পেতে নিই, তাকে বক্ষে আলিঙ্গন করি। তিনি যদি রেখে দেন আমাদের বনের মধ্যে, আমাদের অন্তরকে বিদ্ধ করেন শেল দিয়ে, তবে সখার সে দুঃখের দানকে মস্তকে ধারণ করি, তাঁর মধুর আহ্বান শুনে সেই কণ্টকময় দুঃখের পথে হাস্যমুখে চলি, যে পথে গেলে সাধু ভক্তদের পাওয়া যায়, তাঁর মঙ্গল আদর্শ লাভ করা যায়—সেই পথে অগ্রসর হই। দয়াময় আশীর্ব্বাদ করুন তাঁর হাতের দেওয়া বেদনাকে যেন বক্ষে আলিঙ্গন করতে সদা প্রস্তুত থাকি। কোন্ নিশান হাতে দিয়ে, কোন্ ছবি চ'খের সামনে রেখে বিধাতা যে আমাদের নিয়ে যাবেন কে জানে? আমরা কি কেবল ফুল-বিছানো পথের খোঁজেই চলব—মৃত্যুর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন ক'রে জীবন্মৃত অবস্থায় পড়ে থাকব—এই কি বিধাতার ইচ্ছা ছিল? না, এস আমরা জীবন-সংগ্রামে মোহকে জয় ক'রে, কল্যাণ আদর্শের দিকে অগ্রসর হই। যদি মৃত্যুও হয়, তবে যেন আমাদের সজাগ মৃত্যু হয়—অসাড় মৃত্যু যেন আমাদের কখনও না ঘটে। নির্জ্জীবতা বিস্মৃতি দূর হয়ে যাক্—যদি মরি যেন বীরের মত মরতে পারি।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

নব ব্রহ্মবিদ্যা। *

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত দুরূহ। ইহার মর্ম্মস্থলে উপনীত হইতে হইলে সাধনা ও ঐকান্তিক মনোনিবেশের প্রয়োজন। এত ভাব ইহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত যে সমস্ত মন দিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিলে ইহাকে বুঝা কঠিন। আমি বিষয়টীর নাম দিয়াছি নব ব্রহ্মবিদ্যা। ইংরাজিতে Theology বলিলে বুঝায় Philosophy of Religion—ধর্ম্মের ব্যাখ্যা—ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্বকে বিশদ করা, উহার প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা—ইহাই Philosophy of Religion বা ব্রহ্মবিদ্যা। ইহাকে আমরা অন্য কথায়—ধর্ম্মবিজ্ঞান বলিতে পারি। ভাবকে, জীবনকে অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মবিজ্ঞানের কার্য্য—ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া ধরা। এইরূপ অর্থে "নববিধানে"র যে বিজ্ঞান তাহাকেই আমি "নব ব্রহ্মবিদ্যা" নামে অভিহিত করিয়াছি।

এই সম্বন্ধে ৩টী সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিষয় সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নববিধান জাতীয় বিধান এবং ইহা বিশ্বজনীন বিধান। অদ্য এবিষয়ে ইহার বিশেষত্বের কথা বলিতে চাহি। ইহা প্রথমে জাতীয়, তাহার পরে বিশ্বজনীন তাহা নহে। বরং ইহার বিপরীত, ইহা প্রথমে বিশ্বজনীন, তার পরে জাতীয়। জাতীয় হইয়া বিশ্বজনীন—এ ইহার প্রকৃতি নহে। প্রথমেই ইহা বিশ্বজনীন এবং তাহার পর অন্তর্গতভাবে ইহা জাতীয়।

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৯১০ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে উদ্ভাসিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মের জাতীয়ভাব সর্ব্বপ্রথম ইহুদিদিগের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। দার্শনিক বলিবেন—কেন, ইহুদি ধর্ম্মের এ বিষয়ে বিশেষত্ব কোথায়? জগতের ইতিহাসে যে tribeএ tribeএ যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে, সে যুদ্ধে এক tribeএর দেবতা সেই tribeকে সাহায্য করিতেছেন, অন্য tribeএর দেবতা তাঁহার চিহ্নিত জাতিকে সাহায্য করিতেছেন। এই tribeএ tribeএ যুদ্ধ শেষে দেবতায় দেবতায় লড়াই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহুদিদের সম্বন্ধেও তো তাহাই। তাঁদের একেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অন্য জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের Jehova যিনি, তিনি Lord of Hosts, তাঁহাদেরই দেবতা। তিনি সেনাপতি রক্ষক হইয়া তাঁহাদিগকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিচালিত করিতেছেন। ইহুদিধর্ম্মে জাতীয় ভাব কোথায়।

দার্শনিকের এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ভগবান জাতীয় বিধানের ভাব এই ইহুদি জাতির মধ্য দিয়া যেরূপ নির্ম্মল আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেরূপ ইহার পূর্ব্বে আর কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, ইতিহাসে বিধাতাকে দর্শন—ইহার মধ্যে তখনও সঙ্কীর্ণ ভাব যায় নাই। তখনও চিহ্নিত জাতি আগে—তার পর অন্য জাতি।

ইহার পর আসিল ঈশার ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম "স্বর্গরাজ্যে"র সংবাদ বহন করিয়া আনিল। যে ধর্ম্মের বার্ত্তা—"Kingdom of Heaven", তাহা অবশ্যই বিশ্বজনীন। ইহা সমস্ত মানবের ধর্ম্ম—(Universal religion)। কিন্তু যখন এই ঈশার ধর্ম্ম জগতে বিস্তৃত ও প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন এই উদার ধর্ম্ম কি আকার গ্রহণ করিল? আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে, এই ধর্ম্ম যে সকল জাতির মধ্যে প্রচারিত হইল তাহারা ঈশার এই উদার বিশ্বজনীন ভাব ভুলিয়া গেল।

সুতরাং সেখানেও আবার রণ কোলাহল, আবার যুদ্ধের দৃশ্য ! সেখানে আরম্ভ হইল, Crusades বা ক্রুশের যুদ্ধ। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে যদিও মুসলমানধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম Ethnic religion নহে—কিন্তু Universal অর্থাৎ বিশ্বজনীন—যদিও ইহাদের দ্বার জগতের সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত—কিন্তু সে কেবল ভাবে, কার্য্যে নহে। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম, ভাবে বিশ্বজনীন, কিন্তু কার্য্যে কি ? যুদ্ধ—জাতীয় সঙ্কীর্ণতা। সেই জন্য আমরা শুনি Christian God, Moslem God ইত্যাদি। এই সকল ধর্ম্ম প্রথমে জাতীয়, তাহার পরে সার্ব্বজনীন।

কিন্তু নববিধান কি ? নববিধানের আলোক এই ঃ—ঈশ্বর সমস্ত মানবজাতির ঈশ্বর, শুধু ভাবে নহে, কিন্তু কার্য্যে। ইহা বলিতে গেলে ক্রমবিকাশকে আনিতে হয়। এ যে কেবল শুধু দার্শনিকভাবে চিন্তা করিয়া, মনের ধ্যানের ভিতর দিয়া ভাবিয়া যে, যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর অতএব তিনি সমস্ত নরনারীর ঈশ্বর—এ তাহা নহে। নববিধান এ যুক্তি তর্কের ম্লান আলোকের অতীত এক স্বতঃপ্রকাশিত অভিনব আদর্শের উজ্জ্বল আলোক আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মানব ইতিহাসে জাতির বিভিন্নতা অনিবার্য্য, কে তাহা দূর করিতে পারে ? ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখা যায় যে জগতে অসংখ্য জাতি একটীর পর একটী আসিয়া উদিত হইয়াছে। আবার এক জাতির মধ্যেই কত শাখা, প্রশাখা। আবার প্রত্যেক শাখার রীতি-নীতি ও বিশ্বাস-পদ্ধতি অন্য শাখা হইতে কত বিভিন্ন। এই তো মানব জাতির ইতিহাস। মানব জাতি কখনই এক জাতি নয়, ইহা অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত। কিন্তু নববিধানে এমন নূতন আলোক আসিয়াছে যে, এই যে অসংখ্য বিভিন্ন জাতি এবং এই যে অগণ্য মত ও বিশ্বাস, এ সমুদয়ই একই ধর্ম্মের পূর্ব্বোত্তর বিকাশ। একই বিধাতা সকল জাতির

আচার পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া যুগে যুগে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। এশিয়া এবং ইয়ুরোপের ক্রিয়াকলাপ কত বিভিন্ন। কিন্তু এ সব প্রকাশ তাঁহারই প্রকাশ। প্রত্যেক ধর্ম্ম তাঁহারই বিধান। নববিধানের নূতন আলোকে আমরা এই নূতন তত্ত্ব দেখিতে পাই।

এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন কিরূপে? ইনি মানবের চক্ষু হইতে মোহের কুয়াসা দূর করিয়া তাহাতে দিব্যদৃষ্টি অর্পণ করিয়াছেন। কারণ মানব ইতিহাসে এই যে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ—তাহা বস্তুতঃ দেবতায় দেবতায় বিবাদ। এ বিরোধের মূল কি? এ বিবাদ অবিদ্যা নিবন্ধন। অবিদ্যা অর্থাৎ আবরণ—মোহ—Sectarianism। আমার দেবতা যদি আমার চেনা বেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত হন তবেই আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি, তবেই আমি তাঁহাকে বুঝি, নচেৎ নহে। অন্য জাতি আমার সেই দেবতাকেই পূজা করিতেছেন, সেখানে তাঁহার প্রকাশ একটু বিভিন্ন—আর আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি না। ইহাই অবিদ্যা বা মোহ। এই অবিদ্যার আবরণ খসিয়া পড়িলে, দেবতায় দেবতায় লড়াই অসম্ভব, সাধুতে সাধুতে বিরোধ অসম্ভব, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ অসম্ভব। তখন মানুষ দেখিতে পায়—একই দেবজীবন জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত। নববিধান আমাদের এই শুভদৃষ্টি খুলিয়া দিতেছেন, ইনি আমাদিগকে পঙ্কিল নিম্নভূমি হইতে উত্তোলিত করিয়া এক উচ্চতর নূতন নির্ম্মল ভূমিতে স্থাপিত করিতেছেন। সে উচ্চতর ভূমি বিশ্বজনীন ভাবের ভূমি। সেখানে দাঁড়াইয়া আমরা বিশ্বজগতকে এক অপূর্ব্ব, অচ্ছেদ্য, নির্ম্মল, মধুর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দেখিতে পাইতেছি এবং এই মধুর সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আমরা ভগবানকে নূতন আলোকে বিশ্ববিধাতারূপে দর্শন করিতেছি।

নববিধান প্রথমেই সার্ব্বজনীন এবং ইহারই অন্তর্গত ভাবে ইহা জাতীয়। আমরা হিন্দুজাতি, আমাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি

ভাব ও সভ্যতা ঠিক অন্য জাতির মত হইবে না, হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নহে। এখানে জাতির অর্থ—man with his surroundings—পারিপার্শ্বিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে স্থাপিত মানব। কোন দুই স্থানের ঘটনাপুঞ্জ যখন এক নহে, তখন জাতিতে জাতিতে (এই অর্থে) পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম মূলে কিন্তু এক—একই বিধান সকল জাতির বিধান। আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাব-সভ্যতা, বিদ্যালয় মন্দির—এক কথায় কোন এক জাতির Institutions অবশ্যই সেই জাতির স্বাভাবিক বৃত্তি ও সংস্কারনিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এখন ইহাই যদি প্রকৃত তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে ভাবী ভারতীয় সমাজগঠন বিষয়ে আমাদের সম্মুখে দুই পথ বর্ত্তমান দেখা যাইতেছে। আমরা হিন্দু—এই হিন্দু জাতীয় ভাবকে মূল অবলম্বন করিয়া ইহার ভিতরের যাবতীয় গ্লানি, আবর্জ্জনা, ভ্রম, কুসংস্কার পরিবর্জ্জন করিয়া এবং অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট ভাব আছে তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে এক সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মে উপনীত হইতে হইবে—এই এক পথ। অন্য পথ এই—নববিধান আমাদিগকে যে উচ্চতর ভাবের ভূমিতে উত্তোলিত করিয়া ধরিয়াছেন এবং সেই উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা—জাতীয় ইতিহাসেরই আলোকে—যে নূতন দিব্যদৃষ্টির সহায়ে অভিনব মঙ্গলতত্ত্ব লাভ করিতেছি, সেই মঙ্গল আদর্শে ভারতের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—একটী সংস্কারের পথ, আর অপরটী মঙ্গল আদর্শের নির্দ্ধারিত পথ। যুক্তি মীমাংসার আলোকে শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা মন্দকে পরিহার করিয়া ভালকে বাছিয়া লওয়া—ইহাই সংস্কারের পথ। আর প্রথমেই ঊর্দ্ধ হইতে আলোক আসিল, দৃষ্টির আবরণ খসিয়া পড়িল, মঙ্গল আদর্শ প্রকাশিত হইল, সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ইহাই আদর্শের আহ্বানের পথ। এই দুই

পথের মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বনীয়? উজ্জ্বল, উন্নত ভূমি ছাড়িয়া কে কুহেলিকাচ্ছন্ন নিম্নভূমি হইতে আরম্ভ করিতে চাহিবে?

এখন দেখা যাউক নববিধানের এই বিশ্বজনীন ভাব আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতে চায়।

"আমার পিতার রাজ্য এ বিশ্বসংসার,
তনয়ের আছে পিতৃধনে অধিকার।"

এই বিশ্বজনীন ভাব আমাদের প্রাণে এই উচ্চ অধিকারের কথা জাগাইয়া দেয়। এ আলোক শুধু উচ্ছ্বাস নহে; কার্য্য, দর্শন, ভাব, চিন্তা, সকলই ইহার সমর্থন করে। এ অধিকার আসে কোথা হইতে? এ অধিকার আমরা লাভ করি বিশ্বাসের (Faith) মধ্য দিয়া, আধ্যাত্মিক যোগের ভিতর দিয়া। যদি ইহাতে সন্দেহ আসে তবে আমরা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলি, আমরা হীন, সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ি। Faith থাকিলে আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে দীপ্ত তেজের সহিত বলিতে পারি, "তনয়ের আছে পিতৃধনে অধিকার।" আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে অধিকারও চলিয়া যায়। আর এ সম্বন্ধ থাকিলে পিতার সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া পূর্ণহৃদয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিতে পারি—

"তুমি আমি নরজাতি,
সবে এক প্রেমে মাতি,
ধরিব অখণ্ড চিদাকার।"

যদি জনকতকও আমাদিগের মধ্যে এ বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা ক্রমে জগতের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। এ বিশ্বাস কল্পনা নহে, Evolutionএর আলোক এ বিশ্বাসকে সমর্থন করিতেছে। পূর্ব্বে জগতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কত বিরোধ, কত যুদ্ধ, এখন ক্রমবিকাশ নীতি দেখাইতেছেন, জগতের সকল ধর্ম্মই এক বিধান প্রকাশের

পূর্ব্বোত্তর গ্রন্থি। এই বিকাশের ক্রমোন্নতপর্য্যায়ে আমরা এখন এই উচ্চভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এ বিশ্বাস কল্পনার আকাশে গড়া নহে। এই নববিধানের প্রথম সূক্ষ্ম তত্ত্ব, ইহা প্রথমে বিশ্বজনীন, পরে অন্তর্গতভাবে ইহা জাতীয়।

দ্বিতীয় কথা—নববিধানের আদর্শ কি? এ বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণার অভাব আছে। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। নববিধানের "সমন্বয়ের" কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই সমন্বয় বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? সকল ধর্ম্মই সত্য, না সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে?

যদি Evolution ক্রমবিকাশ ঠিক হয় এবং নববিধান যদি এই Evolution (ক্রমবিকাশের) এর সর্ব্বোন্নত পর্য্যায় হয়, তবে সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, এই নীতিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যদি "ধর্ম্ম" অর্থে "ধর্ম্ম-মত" বুঝি, তাহা হইলে এই নীতি মানা চলে। তাহা হইলে আমরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া সকল ধর্ম্মমত হইতে মন্দ পরিহার করিয়া যাহা ভাল তাহাকে বাছিয়া লইতে পারি। কিন্তু এই নির্ব্বাচন ব্যাপারেও এক কঠিন সমস্যা আছে। আজ আমাদের যাহা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে কাল হয়তো আবার তাহাই মন্দ বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ধর্ম্মমতের আকারের পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য। নূতন সভ্যতা, নূতন ভাব ও ভাষার পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মমতেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম অর্থে যদি বুঝি ভগবানের সহিত মানুষের নিত্য সাক্ষাৎ, জীবন্ত সম্বন্ধ, তাহা হইলে কি সকল ধর্ম্মই সত্য নহে? সকল জাতিই কি বিধাতার এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনুভব করে নাই? সকল ধর্ম্মেই কি ভগবানের জীবন্ত স্পর্শ অনুভূত হয় নাই? যুগে যুগে, জাতিতে জাতিতে সকলেই এ সম্বন্ধ, এ স্পর্শ অনুভব করিয়াছে। তবে কি আমরা বলিব

না যে, জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল ধর্ম্মেই সেই এক বিধাতার প্রকাশ ?

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, এ বলা এক কথা। এখানে ধর্ম্মকে আমরা ধর্ম্মমতে পরিণত করিয়া দেখিতেছি, এবং এইরূপ ভাবে দেখিয়াই যখন আমরা সমন্বয়ের কথা বলি, তখন সমন্বয় হয়—Eclecticism অর্থাৎ সকল ধর্ম্মমত হইতে যাহা আমাদের ভাব ও মতের সহিত মেলে তাহাকে গ্রহণ এবং যাহা মেলে না তাহাকে পরিবর্জ্জন। অবশ্য এ নির্ব্বাচনে যে, ধর্ম্ম-জগতে প্রভূত কল্যাণ সধিত হয় সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সকল ধর্ম্মই সত্য, এ দৃষ্টি এক স্বতন্ত্র বস্তু। ইহা Reason নহে, ইহা Vision। ক্রমবিকাশের প্রণালীতে এই অভিনব ভাব যে, ব্রাহ্মসমাজে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনের কথা ভাবুন। তাঁহার জন্ম বিপ্লবের সময়। সে বিপ্লব কুসংস্কার বনাম সংস্কার। পাশ্চাত্য জগতে বিকৃত খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে Voltaireএর যে অবস্থান, অথবা অতি প্রাকৃতবাদ (Miracles) সম্বন্ধে Hume বা Comteএর যে অবস্থান, ভারতে বিকৃত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার সেই অবস্থান। Comte এই অতিপ্রাকৃতবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শেষে ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত বাদ দিয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, বিকৃতি পরিহার কর, কুসংস্কার পরিবর্জ্জন কর, কিন্তু ধর্ম্মকে বজায় রাখ। ইহা হইতেই Criticism বা ধর্ম্মবিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত হইল। রাজা রামমোহনের মধ্যে কিন্তু এই দুই ভাবের যুগপৎ সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি এক দিকে বীরের ন্যায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, আবার অপর দিকে যাবতীয় ধর্ম্মের

মধ্যে যাহা ভাল আছে তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহার "Precepts of Jesus—a guide to Light and Peace" পাঠ করিলে সকলেই এ কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন, খৃষ্টানেরা আমাদিগকে ভ্রান্ত করিতেছে। সেইজন্য তিনি ঈশার Precepts সংগ্রহ করিলেন। তিনি বলিলেন ইহা হইতে সকলে স্বাধীন ও প্রত্যক্ষভাবে খৃষ্টধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারিবেন। এইরূপে তিনি বেদান্ত হইতেও Precepts সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কুসংস্কার পরিবর্জ্জন করিয়া সকল ধর্ম্মমত হইতে সত্য সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং এখানে আমরা বিধানের প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি না।

তারপর মহর্ষি। তিনি দেখিলেন বেদ অভ্রান্ত নহে, বেদান্তদর্শনও অভ্রান্ত নহে। তিনি অদ্বৈতবাদ পরিহার করিলেন। তাহার পর উপনিষৎকে ভিত্তি করিয়া সেই ভিত্তির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি Fenelon এবং হাফেজ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। এই সকল অমূল্য তত্ত্ব কত ধর্ম্মপিপাসু, তৃষিত আত্মার মধ্যে স্বর্গের অমৃতবারি সিঞ্চন করিল। ইহা অতি উপাদেয়, অতি মধুর। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা ইহার মধ্যে বিধানের ভাব প্রকাশিত দেখিতে পাই না। ভগবান্ যে আপনার দিক হইতে অগ্রসর হইয়া পাপী তাপী, দীন দুঃখী সকলকেই মঙ্গলের উচ্চভূমিতে উত্তোলিত করিয়া লইতেছেন, এ ভাব এখানে নাই।

ইহার পরের ভাব এই—মানুষের সঙ্গে ভগবানের জীবন্ত সংস্পর্শ। ইহাই বিধানের ভাব। এই যদি বিধানের ভাব হইল তবে এ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক আদর্শ কি? সকল ধর্ম্মকে গ্রহণ—সকল সাধুকে গ্রহণ। কিন্তু এ গ্রহণের অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে মহান্ তত্ত্ব আছে সেইগুলিকে বাছিয়া লইয়া আমাদের আদর্শ

গড়িয়া তোলা ? কিন্তু আদর্শ এ ভাবে মেলান কি সম্ভবপর ? ঈশার মোক্ষ আর শঙ্করের মোক্ষ কখনও মিলিবে কি ? তবে আদর্শ কি ?

বহু তত্ত্ব সম্মুখে বিস্তৃত, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে লইব ? গভীর সমস্যার বিষয়। যদি আমরা এই বিভিন্ন আদর্শসমূহের আলোকে একটী সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ না পাই, যাহা পুরাতন কোন আদর্শই নহে, যাহা পুরাতন সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যাহার মধ্যে পুরাতন সকল আদর্শের মাধুর্য্য বিদ্যমান, যদি আমরা এইরূপ একটী স্বপ্রতিষ্ঠ নব আদর্শ লাভ করিতে না পারি, তবে আমরা অকূল সমুদ্রে দিশাহারা হইয়া পড়িব। কিন্তু এ আদর্শ আমরা লাভ করিয়াছি, বিধাতা স্বয়ং এ আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—ইহাই নববিধান। নববিধান Eclecticism নহে ; কিন্তু ইহা একটী নূতন জীবন্ত শক্তি, এক স্বপ্রতিষ্ঠ অভিনব আদর্শ, যাহা জগতের যাবতীয় আদর্শকে রূপান্তরিত করিয়া, আপনার মধ্যে সকলের জীবনী-রস সংগ্রহ করিয়া, নবজীবনে নূতন শিশু হইয়া জগতে দর্শন দিয়াছেন। ইহাই নববিধানের দ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব।

তৃতীয় কথা—এ ধর্ম্মের সাধন কি ? এই নব আদর্শ আমাদিগকে কি সাধনের পথ দেখাইয়া দেয় ? এক কথায় বলিতে গেলে ইহার সাধন এই—"Thy Will be done" "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" ; এই একই প্রার্থনা এ ধর্ম্মের সাধকের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু এই প্রার্থনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইতে করা হইয়াছে।

এক সময়ে সাধক এই প্রার্থনা করিয়াছেন—নিরাশ্রয়ের ভাব হইতে। যাহা হইবার হইয়া যাক্—আমি দুর্ব্বল, অক্ষম, সুতরাং "Thy Will be done" এ এক প্রকার ভাব, ইহা Fatalism ; এরূপ নিরাশ্রয় নির্ভরতা (Resignation) Objective religion (প্রকৃতিতে ঈশ্বর) এর অবস্থা। ঈশ্বর যখন বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে, সুতরাং

তাঁহার ইচ্ছাকে কে বাধা দিতে পারে, অতএব "সকলি সহিব আমি।"

তারপর Subjective religionএর (আত্মায় ঈশ্বর) অবস্থা। এ অবস্থায় মানুষ আপনার আত্মার ভিতরে ভগবানের ইচ্ছা কি তাহাই অন্বেষণ করে। নিজের ইচ্ছা কি, আর ভগবানের ইচ্ছা কি, তাহা পৃথক করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। তাহার পর আপনার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে দমন করিয়া তাঁহার ইচ্ছার দিকে চলিতে চায়, নিজের ইচ্ছা দিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়—"Thy Will be done।"

কিন্তু বিধানের ভাব এ দুইকেই গ্রহণ এবং দুইকেই অতিক্রম করিয়া। আমার নিজের বাসনাকে দমন করিয়া জীবনে তাঁহার ইচ্ছা অনুসরণ করিব; আর বাহিরের প্রকৃতিতে তাঁহার যে ইচ্ছা প্রকাশিত তাহাও জানিব; তাহার পর এই ভিতর এবং বাহিরের ইচ্ছাকে মিলাইয়া লইয়া সেই ইচ্ছাকে পালন করিব। Subjective ও Objective উভয়কে মিলাইয়া লইব। বিজ্ঞানের আলোক যেখানে নাই সেখানে বিধান থাকিতে পারে না। প্রকৃতিতে বিধাতার যাহা ইচ্ছা বিজ্ঞান তাহাই প্রকাশ করিতেছে। বিজ্ঞানকে মানিতেই হইবে। রোগ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বজ্রপাত এ সকল কি নিশ্চেষ্ট, নিরাশ্রয় নির্ভরতার সহিত সহিয়া যাইব? রোগ মুক্তির উপায় গ্রহণ, দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় অবলম্বন, সেই বিধাতারই ইচ্ছা। সুতরাং সজাগ-সচেষ্টভাবে সেই ইচ্ছাকে জানিয়া, ভিতর বাহির মিলাইয়া লইতে হইবে। আমরা কখনই নিশ্চেষ্ট নিরাশ্রয়ের ভাব (Passive) অবলম্বন করিতে পারি না, এরূপ করিলে বিধানকেই অমান্য করা হয়। দেখ ইয়ুরোপের কি সজাগ, জীবন্ত চেষ্টা প্রকৃতিতে এই বিধাতার ইচ্ছা জানিবার জন্য। যাহারা স্বাভাবিক বিকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছে, সেই মূক, বধির ও অন্ধদিগের দুঃসহ অভাব মোচনের জন্য ইয়ুরোপের কি জীবন্ত উদ্যম। এই জীবন্ত উদ্যম সেখানে প্রকৃতির বাধাকে ব্যর্থ করিয়া বিধাতার ইচ্ছাকেই পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

এই নবসাধনই নববিধানের তৃতীয় তত্ত্ব।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

নববিধানের আদর্শ *।

বিগত ত্রিশ বৎসর হইতে ব্রহ্মমন্দিরে এই গান হইয়া আসিতেছে:

কর হে নববিধান মূর্ত্তিমান এ জীবনে,
যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, সবাকার সম্মিলনে।
সক্রেটিশের আত্মজ্ঞান,
ঋষিদের যোগ ধ্যান,
মূশার বিবেক নীতি,
যাচি তব শ্রীচরণে।
ঈশার অভেদ ভাব,
চৈতন্যের মহাভাব,
শাক্যের নির্ব্বাণ দয়া,
দাও দীন অকিঞ্চনে।
মহম্মদের নিষ্ঠা রতি,
ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তি,
জনকের অনাসক্তি,
সঞ্চার হৃদয় মনে॥

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে উদ্ভাসিত।

এ গানের গূঢ় অর্থ কি তাহা অনেকেই হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক এ গানের প্রকৃত অর্থ কি? জীবন গঠন বিষয়ে কি আলোক আমরা ইহা হইতে লাভ করি? ইহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

আলোচনার পথ পরিষ্কারের জন্য প্রথমেই দুই চারিটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১। মানুষ প্রত্যেকেই জীবনকে ব্যক্তিগতভাবে দেখে। মানুষ ব্রহ্মসন্তান; ভগবানের সহিতই তাহার নিত্য সম্বন্ধ, আর আর যাবতীয় সম্বন্ধই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন অনন্ত হইতে আসিয়াছে, জীবনের আদর্শ, কর্ত্তব্য, সমস্ত তাঁহাকে লইয়াই। যাহাতে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ গূঢ় হয় ইহাই সকলের সাধনা। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আর একটী সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ পারিপার্শ্বিক ঘটনাপুঞ্জের (Surroundings) সঙ্গে সম্বন্ধ, যাহার ভিতরে মানবের জন্ম। কিন্তু এই Surroundingsএর সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ভর করে বর্ত্তমানে যাহা মানুষের জীবনের অবস্থা, সেই সাময়িক অবস্থার উপরে। জীবনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এইরূপে যত সাধু, ভক্ত, চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সহিত জীবনের সম্বন্ধ আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সাময়িক অবস্থার উপরই নির্ভর করে। এক সময়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ কত মধুর মনে হয়। আবার এমন এক সময় আসে যখন তাঁহাকে আর তেমন ভাল লাগে না। এরূপ হয়, কারণ তখন মনের অবস্থা ভাল নয়। আবার এক অবস্থায় ঈশাকে কত মিষ্ট মনে হয়, তাঁর জীবনের সকল কথা তখন কত ভাল লাগে, তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করা তখন কত সহজ হয়। আবার এক সময়ে তাঁহাকে ভাল লাগে না, কেহ তাঁহার কথা বুঝাইতে আসিলে বিরক্তি বোধ হয়। আকাশে যেমন

অগণ্য গ্রহপুঞ্জ ঘুরিতেছে, তেমনি অনন্তের আকাশে, অনন্তের চারিদিকে অযুত জীবাত্মা ঘুরিতেছে। আকাশে যেমন Planes আছে, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও Planes আছে। ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দুইটী গ্রহ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয় তখনই সেই দুই গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ হয়, তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়, তাহার পর আবার পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ সুদূরে চলিয়া যায়! এখন Halley's Comet পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেইজন্য সেই ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ হইয়াছে, পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার বিষয়ে কতই আলোচনা করিতেছেন। দু'দিন পরে যখন সে আবার দূরে সরিয়া যাইবে, তখন পৃথিবীর সঙ্গে আর তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? এমনি করিয়া অগণ্য আত্মা চিন্ময়রাজ্যে চলিয়াছে—সেই অনন্ত পরমাত্মাকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহারই চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতেছে। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এক Orbit (কক্ষ) অন্য Orbitকে Cross করে, তখন উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়— তাহার পর আবার কোথায় কোন্ সুদূরে চলিয়া যায়।

তেমনি আত্মীয়দিগের মধ্যেও। শরীর কাছে থাকিলেই কি আত্মার যোগ থাকে? আমরা "পরকালে মিলনের" কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু পরকাল কি Town Hall—মৃত্যুর পর সকল আত্মা সেখানে গিয়া মিলিবে? না, ইহকালে যদি আত্মায় আত্মায় ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে, তবেই পরকালে তাহাদের মিলন সম্ভব! তাহা না হইলে মৃত্যুর পর ঐ আকাশের গ্রহপুঞ্জের ন্যায় এক আত্মা আর এক আত্মা হইতে কোথায় কোন সুদূরে চলিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য বলিতে ছিলাম, ভগবানের সঙ্গেই মানবের Direct (প্রত্যক্ষ) সম্বন্ধ; তিনিই মধ্যবিন্দু। আর আর বস্তুর সহিত যে সম্বন্ধ তাহা মনের সাময়িক অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

এখন, এইখানেই কি আমরা আসিতে পারি না? চিন্ময়ের সহিত এই অখণ্ড যোগ, ইহাই তো চিরন্তন, নিত্য সম্বন্ধ। বিজ্ঞান যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (Classification) বিভাগ করিয়াছে, সে তো কৃত্রিম! আমাদের মানব প্রকৃতির ক্ষুদ্রতার জন্য, আমাদের ধারণার সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন, এই সকল ক্ষুদ্র কুঠুরির সৃষ্টি। মানুষ ফুলকে নানা জাতিতে বিভক্ত করিয়াছে—এটী গোলাপ, এটী বেল, এটী চামেলি। কিন্তু গোলাপ যদি বলে "হে মানব, আমি তোমার এ সঙ্কীর্ণ বিভাগ মানিতে প্রস্তুত নহি; বিধাতা এ বিভাগ করেন নাই, তুমি করিয়াছ এ বিভাগ; তোমার বুঝিবার সুবিধার জন্য তুমি আমাকে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছ, নচেৎ আমি তো সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা (One in the whole universal system); বিশ্বের সমস্ত আলোক ও বাতাসের সহিত আমার সম্বন্ধ, ব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ড নিয়মের আমি অন্তর্গত"—গোলাপ যদি এ কথা বলে তবে বৈজ্ঞানিককে নিরুত্তর হইতে হয়। কিন্তু গোলাপ এ কথা বলিতে পারিলে মানুষ তো এই সঙ্কীর্ণ বিভাগের বিরুদ্ধে আরো তীব্রতর প্রতিবাদ করিতে পারে। কেহ বলিল, তুমি হিন্দু, তুমি ভারতবাসী, ভারতে তোমার জন্ম। আমি কি বলিতে পারি না, ভাই, তুমি সমস্ত বিশ্ব-জগতকে একত্রে ভাবিতে পার না, তাই তুমি আমাকে ক্ষুদ্র করিতেছ, তাই তুমি আমাকে নাম দিয়া, জাতি দিয়া সঙ্কীর্ণ করিতেছ। বিধাতা তো আমাকে কোন সীমাতে আবদ্ধ করেন নাই, অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার উদার, অবাধ সম্বন্ধ। চন্দ্র সূর্য্যর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, বেদ বেদান্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, ইংলণ্ড আমেরিকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, প্যালেষ্টাইন্ মক্কার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আমি এই উদার, প্রমুক্ত সম্বন্ধের আলোকে আমার জীবন গড়িয়া তুলিব, কারণ

অনন্তকালের ও অনন্ত দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি ছোট নহি, তুমিই আমাকে ছোট করিতেছ। এই হইল এ বিষয়ের এক দিক।

তাহার পর অন্য দিক। মানুষ সঙ্কীর্ণ বলিয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড সম্বন্ধের মধ্যে সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আনিয়াছে। ধর্ম্মের মধ্যে অনেক Classification ঘটিয়াছে। এইবার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

Sociology বা সমাজবিজ্ঞান পাঠ করিলে দেখা যায় যে ক্রমবিকাশ নীতি প্রত্যেক সমাজকে স্তরে স্তরে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে Civilisation বা সভ্যতার চারটী স্রোত (বা ধর্ম্ম) প্রবাহিত হইয়া আসিয়া বর্ত্তমান যুগে একত্র হইয়াছে। তাহার পর ইহারা মিলিত হইয়া কি আকার ধারণ করিবে, কি নূতন বিশালরূপ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হইবে, তাহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মজগতের সমস্যা। এই চারিটী সভ্যতার স্রোত—হিন্দু, বৌদ্ধ, সেমিটিক্, ও খৃষ্টীয়। এই বিভিন্ন সভ্যতার এখানে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

১। হিন্দু;—ইহা ভারতবর্ষের বস্তু। পঞ্চনদের তীরে বেদ উপনিষদে ইহার আরম্ভ। তাহার পর এই স্রোত ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে পড়িয়াছে। ইহা অতি মহান্, গম্ভীর। ইহার মধ্যে আবার অনেক শাখা প্রশাখা আছে। ইহার নিজের বিশেষ লক্ষণ আছে, ভাবের বিশেষ বিকাশ আছে, ইহার ভিতর ক্রমবিকাশের স্তর আছে।

২। বৌদ্ধ;—হিন্দুধর্ম্ম নদী প্রবাহিত হইতে হইতে যেন হঠাৎ একস্থানে আঘাত (বাধা) প্রাপ্ত হইল। ইহা হইতে আর একটী নদী বহির্গত হইয়া ছুটিল—শেষ আবার এই শাখানদীর জল মূল

হিন্দুনদীতে আসিয়া পুনর্ম্মিলিত হইল। ইহার ফলে মূল নদী অধিকতর বিশালতা ও গভীরতা লাভ করিল। তাহার পর ইহা পুনর্ব্বার শাখা-রূপে বহির্গত হইয়া ভিন্ন দিকে ছুটিয়া চলিল। সিংহল, জাপান, ও চীনে গিয়া ইহার তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেই সকল স্থানেও আবার ইহার বিকাশ ও ক্রমোন্নতির স্তর লক্ষিত হইল।

৩। সেমিটিক্ ;—Judaism ইহার আরম্ভ। সেখানে একেশ্বরবাদ সমুজ্জ্বল। ভগবান সেখানে এক সমগ্র জাতির নেতা—তিনি Lord of Hosts হইয়া অন্য জাতিকে জয় করিতেছেন। ইব্রাহিম, মূশা হইতে চলিয়া আসিতে আসিতে ইহা মোসলেম ধর্ম্মের ভিতর দিয়া শেষে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল।

৪। খৃষ্টীয় ;—এ সভ্যতা জটীল (Complicated) বস্তু। ইহার আরম্ভ Judaismএ নহে। গ্রীক জাতির সভ্যতা ইহার গঠনের উপাদান যোগাইয়াছে। সক্রেটিশ্, প্লেটো, আরিষ্টটল্ ইহাতে আপনাদের অনুপ্রাণনা যোগ করিয়া গিয়াছেন। Stoicsরা ইহাতে তাঁহাদের দৃঢ়তা অর্পণ করিয়াছেন। তাহার পর Roman civilisation, Judaism এবং সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-নীতিও ইহার গঠনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। Barbariansদের বিশেষ লক্ষণও ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাহার পর সেণ্ট পল ও ঈশার মধ্যে ইহার উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। কিন্তু এই সকলের প্রাণ হইলেন—ঈশা। এই সকল বিভিন্ন উপাদান সম্মিলিত হইয়া সৃষ্ট হইল নূতন এক প্রকাণ্ড জলস্রোত—এক নব সভ্যতা। এখানেও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান।

বর্ত্তমান যুগে এই চারিটী বিভিন্ন স্রোতের সংঘর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের মিলন হইয়াছে একথা বলিতে পারি না, কিন্তু সংঘর্ষণ যে উপস্থিত এ কথা অস্বীকার করা চলে না। ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ভাব, লক্ষণ, ইতিহাসেও আদর্শ আছে। কিন্তু ইহাদের

মধ্যে সংঘর্ষ সমুপস্থিত। ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের আদর্শ এই সংঘর্ষের মীমাংসা হইতে স্থিরীকৃত হইবে। এই বিভাগ কি চিরন্তন বিভাগ, না ইহাদের ভাঙ্গিয়া, ইহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া অভ্যুদয় হইবে এক নূতন আদর্শের ?

এখানে এই চারিটী ধর্ম্মের প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষণ ও মূল ভাবেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম—হিন্দুধর্ম্ম। ইহার বিশেষত্ব উপনিষদে। উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোন্নতির পর্য্যায় পরম্পরার মধ্য দিয়া ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির ইতিহাস সেই উপনিষদেরই বিশেষ ভাবের বিকাশ—তাহারই ব্যাখ্যা, তাহারই আলোচনা। মায়া এবং ব্রহ্ম এই দুইটী ভাবকে লইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ, ইহাই মূল ভাবনার বিষয়। বহুর ভিতর দিয়া একে উপনীত হওয়া—ইহাই সাধনা। এই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকৃতি আমরা তিনটী চিত্রে দেখিতে পাই ;—

(ক) ভাস্করানন্দ—শঙ্করের প্রতিনিধি—যোগীর আদর্শ। বহুকে জয় করিয়া মায়াকে উড়াইয়া দিয়া যোগের পথে অদ্বৈতে উপনীত হইতে হইবে। বহুকে উড়াইয়া একেতে লয়—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের লক্ষ্য। বর্ত্তমান সময়ে ভাস্করানন্দ সেই যোগী শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়াই যোগ সাধনার চরম লক্ষ্য।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গ—জীবন্ত প্রেমের আদর্শ—ভক্তের আদর্শ। মায়া-ব্রহ্মের—জীবন্ত ব্যাখ্যা। এখানে মায়ার বিভাগ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের যে মায়া সে মায়াকে জয় করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম মায়া শূন্য নহেন, ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন। চিন্ময় বৃন্দাবনে ব্রহ্মের হ্লাদিনী মূর্ত্তি বিরাজিত। ব্রহ্মের অনন্ত প্রেম, মায়া নহে—তাঁর অতুল অনন্ত সৌন্দর্য্য,

মায়া নহে—ইহা চিরন্তন সত্য। এই সৌন্দর্য্য নির্ভর করিতেছে ব্রহ্মের অনন্তলীলার উপর, এখানে ভক্তির উচ্ছ্বাস, প্রেমের মত্ততা, লীলার আনন্দ!

(গ) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—শঙ্কর ছিলেন সন্ন্যাসী। গৌরাঙ্গ শঙ্করের মত না হউন, তিনিও সন্ন্যাসী। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মে গার্হস্থ্যধর্ম্মের আদর্শ প্রতিভাত। Resignation (আত্ম নিবেদন) সহায়ে, বিধাতার ইচ্ছাকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া, গৃহীকে সন্তুষ্ট চিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। সমাজে বিভাগ আছে, সেখানে শূদ্র আছে, দরিদ্র আছে; কিন্তু সকলেরই সেখানে কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে। এখানে নিজের ইচ্ছা, অভিরুচির কোন অবসর নাই; প্রফুল্ল চিত্তে তোমাকে "বর্ণের" ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। যদি এইরূপে অবিচলিত চিত্তে, নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পার, তাহা হইলে এ জন্মে যে শূদ্র আছে, পরজন্মে সে ব্রাহ্মণ হইবে। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে একটী মহৎ শিক্ষা লাভ হইতেছে—ইহা শিখাইতেছে আবার সন্তোষ। রোগ আসুক, দারিদ্র্য আসুক—সে সকলের মধ্যে সন্তুষ্টি অবিচলিত। অত্যাচার আসুক, নিপীড়ন আসুক, অগাধ সন্তোষের স্নিগ্ধ স্পর্শে সকল জ্বালা নির্ব্বাপিত। জগত এ সন্তোষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যায়। এই আদর্শে গঠিত মানবমণ্ডলী অত্যন্ত নিরীহ চরিত্র হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়—বৌদ্ধধর্ম্ম। চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে এ ধর্ম্মের যে বিকাশ ও পরিণতি হইয়াছে তাহার বিষয়ে আমার বিশেষ করিয়া জানা নাই। সুতরাং সে আলোচনা আমি এখন পরিহার করিলাম। আমাদিগের নিকট এ ধর্ম্ম অশোকের সময়ের ধর্ম্ম বা বুদ্ধদেবের নিজের ধর্ম্ম। আমরা সেইখানেই বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিব। বুদ্ধদেবের আদর্শ—তৃষ্ণাকে একেবারে জয় করা। বোধিদ্রুমের তলে বসিয়া যে দিন তিনি নবজ্ঞান লাভ করিলেন, সে দিন তাঁহার মুখে কি নির্ম্মল

আনন্দের জ্যোতিঃ! তৃষ্ণাকে জয় করিয়া বিজয় গৌরবের সমুজ্জ্বল দীপ্ত শিখা তাঁহার উন্নত ললাটে কি অপূর্ব্ব মহিমা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল! সে কি আনন্দ! তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিলেন —

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো, দুঃখাজাতি পুন প্পুনং
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং নকাহসি,
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা, গহকূটং বিসংখিতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং, তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।"

"Many a House of life
Hath held me—seeking ever Him Who wrought
These prisons of the senses, sorrow-fraught;
Sore was my ceaseless strife!
But now,
Thou Builder of this Tabernacle—Thou!
I know Thee! Never shalt Thou build again
These walls of pain,
Nor raise the roof-tree of deceits, nor lay
Fresh rafters on the clay;
Broken Thy House is, and the ridge-pole split!
Delusion fashioned it!
Safe pass I thence—Deliverance to obtain."

E. Arnold

"হে গৃহকার, তোমাকে আমি অনেক খুঁজিয়াছি, অনেক কষ্ট আমি সহ্য করিয়াছি—তোমার দেখা পাই নাই। কিন্তু এইবার আমি তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। তৃষ্ণাই নির্ম্মাণ করে এই গৃহ (শোক

দুঃখময় দেহ); কিন্তু তৃষ্ণা আর এ ঘর নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। আমি এ ঘরের ভিত্তি ভগ্ন করিয়াছি—চিত্ত আমার এখন সংস্কারশূন্য। তৃষ্ণা আমার ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। (আর জন্ম হইবে না)।”

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ এই—সংস্কার হইতে তৃষ্ণার উদ্ভব, তৃষ্ণা হইতে দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু। সেই তৃষ্ণাকে জয় কর—মৈত্রীকে অবলম্বন কর। এই মৈত্রীর অর্থঃ—জীবে দয়া, ধর্ম্মে ক্ষমা (Toleration). সকল কার্য্যে উদার সহানুভূতি। এই ভাব আসিয়া উত্তরকালে হিন্দু ভাবের সহিত মিলিত হইল।

তৃতীয়—সেমিটিক্ ধর্ম্ম। ইহুদি ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম ইহারই অন্তর্ভূত। সকলেই জানেন ইহার বিশেষত্ব একেশ্বরবাদ—অদ্বিতীয়ের আরাধনা। এই বিশেষ ভাবের কথা উজ্জ্বলরূপে আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল যখন আমি তাজমহল দেখিয়াছিলাম। ইউরোপে আমি অনেক Cathedrals দেখিয়াছি; সেই সকল Cathedralএর মধ্যে কত চিত্র, বিচিত্র প্রস্তরের মূর্ত্তি। মেরি, যীশু প্রভৃতির কত সুন্দর রমণীয় মূর্ত্তি। তাহাদের অঙ্গনে কত সাধু মহাত্মার সমাধিস্তম্ভ, কত নামলেখা, কত অপরূপ মূর্ত্তি। Westminster Abbey, St. Paul's Church প্রভৃতিতেও ঐরূপ কত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও স্তম্ভ, কত কবি, বাগ্মী ও প্রতিভার স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া দণ্ডায়মান! কিন্তু তাজে কি দেখিলাম? সেখানে একটীও মূর্ত্তি নাই—মানুষের ত দূরের কথা—একটী পত্র, পুষ্প বা লতিকারও প্রতিকৃতি কোথাও অঙ্কিত দেখিলাম না। এখানে যেন মানুষকে ভুলিয়া—মানুষ যে কত ক্ষুদ্র অকিঞ্চন দীন সেই ভাব অন্তরে জাগাইয়া, সেই নির্ম্মল শুভ্র মর্ম্মর সমাধি ঊর্দ্ধে অনন্তের দিকে—অদ্বিতীয় মহিমাময় পুরুষের দিকে আপনার মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুধু কোরাণের বচন তাহার গাত্রে লেখা—সেখানে শুধু অদ্বিতীয়ের মহিমা কীর্ত্তন। নগণ্য মানবের

স্মৃতি সেই চারু চিত্রপট হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত। তাজের পার্শ্বে জুম্মা মসজিদ্—সেখানে অদ্বিতীয়ের সিংহাসন তলে ক্ষুদ্র বৃহৎ একত্রে সমবেত—সেখানে বাদসাহও যা, প্রজাও তা। সেখানে শুধু সাম্যের মঙ্গল মন্ত্র,—সেখানে শুধু অদ্বিতীয় একেশ্বরের মহিমা—অন্য কিছুরই অবকাশ নাই।

চতুর্থ—খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। ইহার বিশেষত্ব মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্ব শুধু সাম্যবাদ নহে, কিন্তু প্রাণের যোগে। এই পবিত্র প্রাণের যোগকে যেমন এ ধর্ম্ম মহিমান্বিত করিয়াছে, এমন আর কোন ধর্ম্ম নহে। হিন্দু আপনার মুক্তির জন্য কঠোর তপস্যাপরায়ণ; বৌদ্ধ মৈত্রীর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন; এ সকলই ঠিক। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে মিলিয়া যে এক বিচিত্র মঙ্গলরাজ্য গঠিত হয় সে সংবাদ ইহারা জগতকে শুনান নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সে অপরূপ রাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন। সে রাজ্য—Kingdom of Heaven। সে রাজ্য মায়ার রাজ্য নহে—সে রাজ্য বিধাতার আশীর্ব্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। "Thy Will be done" সে রাজ্যের মঙ্গল মন্ত্র। এ আদর্শে Aristotle ও Roman civilisation এর প্রভাব আছে স্বীকার করি, কিন্তু এ আদর্শে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সেই মহিমান্বিত পুরোহিত মহর্ষি ঈশা। ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর মনে হয় যে এ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল এশিয়াতে, কিন্তু এ ধর্ম্মকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল এশিয়া নহে, ইউরোপ। সেই ইউরোপে সমাজ ও সাম্রাজ্যের মধ্যে বিধাতার ইচ্ছা প্রকাশিত হইল। সেখানে আদর্শ হইল Fellowship—বা ভ্রাতৃত্বের পবিত্র মিলনের মধ্য দিয়া "Kingdom of Heaven"এ উপনীত হওয়া।

এ ধর্ম্মের আর একটী বিশেষত্ব—Crossএর শিক্ষা—"Worship Sorrow"। ইহার এ অর্থ নয় যে দুঃখকে নিরাশ্রয় নির্ভরতার সহিত

নীরবে বহন করিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই—দুঃখকে মস্তকে ধারণ করিয়া লইবে এই ভাবিয়া যে, সে দুঃখ বিধাতারই দান। Cross তাঁহারই মঙ্গল হস্তের দান, সে দান প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, Crossই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শেষ কথা নহে; ইহার শেষ কথা—"Resurrection"—নবজীবন। ভগবান Cross দেন সত্য, কিন্তু ভগবানই আবার সেই Crossকে জয় করিবার শক্তিও মানবকে অর্পণ করিয়াছেন।

"Thou madest Death ; and lo, Thy foot
Is on the skull which Thou hast made."

Tennyson.

"তুমিই মৃত্যুকে সৃজন করিয়াছ; কিন্তু তুমিই আবার সেই মৃত্যুর উপরে পা দিয়া তাহাকে জয় করিয়াছ।" এই "Resurrection" খৃষ্টীয় আদর্শের বিশেষত্ব। আমাদের দেশের গৌরবজনক আদর্শ—দুঃখ হইতে আত্যন্তিক মুক্তি। কিন্তু এ দুঃখ দূরে রাখিবার জিনিষ নহে; ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু ইহার উপরে বিজয়ী হইতে হইবে। যদি তুমি নিজের দুঃখ খুঁজিয়া লও তবে সে তোমার নিজের কর্ম্মফল, উহা বিধাতার দান নহে। কিন্তু বিধাতার দেওয়া যে দুঃখ তাহা সয়তান নহে—তাহা মায়া নহে—তাহা বিধাতারই রচনা। ইউরোপ এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সেই জন্য সেখানে সমাজ, জাতি ও Stateএর বিকাশ হইয়াছে। দুঃখকে জয় করিয়া দুঃখ হইতে সহানুভূতি লাভই সেখানকার সাধন, সেই জন্যই সেখানে দীন-দুঃখী, রোগপীড়িতদিগের দুঃখ বিমোচনের এমন সজাগ চেষ্টা, সেখানে Hospitals, Deaf and Dumb Schools, Bands of Hope ইত্যাদি।

এখন এই চারিটী ধর্ম্মস্রোতের সংঘর্ষে দাঁড়াইতেছে দুইটী আদর্শ—(১) শঙ্কর, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, শ্রীগৌরাঙ্গ; (২) Crossকে জয় করিয়া

Kingdom of Heavenকে স্থাপন করা। ইহার মধ্যে কোন্‌টীকে আমরা গ্রহণ করিব? ইহার মধ্যে কোনও একটীকে গ্রহণ করিলেই কি আমাদের চলিবে? অথবা এই উভয়ের মিলনে (বাহ্যিকভাবে মিলন নহে, কিন্তু জীবনের মিশ্রণের ভিতর দিয়া যে মিলন সেই মিলনে)—এক অভিনব আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে, সেই আদর্শই আমাদের আদর্শ হইবে? এখন সকলেরই হয়তো মনে হইতেছে এখানে মিলনের সাধারণ ভূমি কোথায়? এখানে তো দেখিতেছি Conflict বা সংঘর্ষ! বর্ণাশ্রম বলিতেছেন—তুমি শূদ্র, কিন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে—তুমি বর্ণধর্ম্মে সন্তুষ্ট থাক। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বলিতেছেন—ধর্ম্মজগতে প্রত্যেক মানবের পূর্ণ অধিকার, সেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্যের কোন অবকাশ নাই। শঙ্কর বলিতেছেন—সংসার অসার, অনিত্য, মায়া; সন্ন্যাসী হও, যোগী হও, বহুকে উড়াইয়া দাও। Cross বলিতেছেন—সংসারের কষ্ট বিধাতার বিধান; ইহাতেই মানবনিয়তির পূর্ণ চরিতার্থতা; দুঃখকে গ্রহণ কর, কিন্তু দুঃখকে জয় কর; দুঃখের মস্তককে অবনত করিয়া তাহার উপরে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। চৈতন্য শিখাইতেছেন—প্রেমের মত্ততা। ঈশা বলিতেছেন—শুধু প্রেমের মত্ততা, সে তো অনেক সময় ভাবের-বিলাস, তাহা লইয়া কি হইবে? সংসারে কর্ম্মবীর হও, কর্ম্মই প্রকৃত উপাসনা, ভাবের প্রমত্ততায় কর্ম্মকে নষ্ট করিও না। আর আমরা শ্রীচৈতন্যের জীবনে দেখিয়াছি যে, অনেক সময় তিনি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে পারিতেন না, অনেক সময় বলিতেন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। শেষ তিনি সংসার হইতে চলিয়া গেলেন, পুরুষোত্তমের অপরূপ সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ঈশা সেইজন্য বলিলেন—ভাবের বিলাসিতা নহে কিন্তু কর্ম্মের কঠোর তপস্যা—দুঃখ জয়ের সুমহান্ ব্রত চাই—জাতীয় জীবন চাই, কেবল আপনাকে লইয়া মুক্তিলাভ অসম্ভব।

এইরূপ সংঘর্ষ। এখন কোন্ পথ গ্রহণ করিবে? ইহার মীমাংসা কোথায়? ইহার মীমাংসা বুদ্ধির বিচারে কখনই হইবে না। ইহার একটু গ্রহণ করিয়া, উহার একটু গ্রহণ করিয়া আপোষে নিষ্পত্তি করিলে চলিবে না। ধর্ম্মের অধিকরণে আপোষে নিষ্পত্তির স্থান নাই। তবে পন্থা কি? চারিটী ধর্ম্মস্রোতের যে বিভাগের কথা আলোচিত হইল উহা কি স্বাভাবিক চিরন্তন বিভাগ? আমরা প্রথমেই বলিয়াছি এ বিভাগ বিধিনির্দ্দিষ্ট নহে—উহা কৃত্রিম। ধর্ম্ম অখণ্ড উদার বস্তু, আকাশের ন্যায় বিশাল—বাতাসের ন্যায় বিশ্বব্যাপী—উহাতে সীমা নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই, গণ্ডি নাই। বিভাগ মানুষ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মকে লাভ করিতে হইলে এই সকল ক্ষুদ্র কৃত্রিম বিভাগের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে—অনন্তের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিয়া—তাঁহার ইঙ্গিত দেখিয়া—তাঁহারই মঙ্গল আলোকে শুভ সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। সভা সমিতি করিয়া, যুক্তি বিচার তর্ক আলোচনা দ্বারা কখনই আদর্শ লাভ করা সম্ভবপর নহে। সহজ, সরল ও অকুণ্ঠিতচিত্তে জীবনের কার্য্য করিয়া যাও, কার্য্য করিতে করিতে বিধাতার কৃপায় আদর্শের আলোক হৃদয়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে—এবং তখনই নববিধানের মঙ্গল আদর্শ লাভে জীবন ধন্য হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়

বিভিন্ন আদর্শের মিলন ও ভাবী আদর্শের বিকাশ*।

এখানে সকলে সমবেত হইয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে বলিতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য আলোচনা। আমার একান্ত ইচ্ছা সকলে স্বাধীনভাবে একটী বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আসিয়া এখানে পরস্পরের ভাব ও

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৯১০ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে উদ্ভাসিত।

চিন্তা জ্ঞাপন করেন। এইরূপেই বিষয়টীর প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ও মূলভাব উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

অদ্যকার আলোচনার প্রথমেই এই প্রশ্ন উদিত হয়—জগতের চারিটী প্রধান সত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া যে ধর্ম্মভাব বিরাজিত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন কিরূপে সম্ভব। আমি সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান যুগে যাবতীয় বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত। এ যুগে জগতের জাতি সমুদয় একত্র সম্মিলিত; সাহিত্য, চিন্তা প্রভৃতির ব্যবধান অন্তর্হিত। এখন প্রশ্ন এই—কিরূপে এ সমুদয় বিভিন্ন আদর্শের মিলন সম্ভবপর—ভবিষ্যতের আদর্শ কি আকার গ্রহণ করিবে?

এখানে প্রথমেই দুই একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সংঘর্ষ ও মিলনের কথা উঠিলেই তাহার সহিত ভাবী আদর্শের কথাও অনুস্যূত থাকে। এই মিলনের কথা মনে হইলেই আমার একটী কথা সর্ব্বদাই মনে হয়—সে তীর্থযাত্রার কথা। এ "তীর্থযাত্রা" সকলে চান না; কিন্তু অনেকের আবার এটী Passion, প্রাণের কামনা। এ তীর্থযাত্রা কি রকম? এক রকম আছে লোকে নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য হিমালয়ে যান, সমুদ্রতীরে গিয়া বাস করেন। এ কিন্তু ঠিক তীর্থ যাত্রা নহে। প্রকৃত তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য—জল হাওয়ার পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন—চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলীর পরিবর্ত্তন—প্রকৃতির নবীনতর শোভা সৌন্দর্য্য উপভোগ। কিন্তু শুধু ইহাও নহে—ইহা অপেক্ষাও গূঢ়তর উদ্দেশ্য আছে। সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া তীর্থে গমন করিলাম—সেই তীর্থক্ষেত্রের পূণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া সেখানকার প্রকৃতির মর্ম্মস্থল হইতে প্রাণ এক অপূর্ব্ব বস্তু লাভ করিল—সে যে কি বস্তু তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব। যখন আমি হরিদ্বারের পুণ্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সেখানকার সেই অনন্ত নীলাকাশ, সেই ধ্যানমগ্ন তুষার-

কিরীট গিরিরাজ হিমালয়ের সুগম্ভীর মূর্ত্তি, সেই কলনাদিনী প্রসন্নসলিলা ভাগিরথী, সেই অপূর্ব্ব সাধু সমাগম, সেই রজতশুভ্র-বিমল-জলধারা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, তখন প্রাণের মধ্যে যে স্নিগ্ধ সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা ভাষায় কিরূপে বর্ণনা করিব? প্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপ রস গন্ধ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেন মর্ত্ত্যের আবিলতাকে স্বর্গের আনন্দ ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। নিমেষে যেন নূতন জীবন লাভ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা-মেখলা কাশীর কমনীয় দৃশ্য! সেই ভাস্করানন্দ, সেই পুণ্যতোয়া ভাগিরথী! মনপ্রাণ অপূর্ব্ব পুলকাবেশে বিভোর হইয়া উঠিল। আবার যখন দেখিলাম সেই সৌন্দর্য্য সম্ভারের চারুচিত্রপট, সেই অপূর্ব্ব প্রেমের অপূর্ব্ব স্মৃতি-মন্দির তাজ—তখন সেই "তাজ" আমার চক্ষে তীর্থের মতই প্রতিভাত হইল! সেই তাজমহল—আবার সেই জুম্মা মসজিদ! সেখানকার আকাশ বাতাস যেন মধুময়—কি এক গম্ভীর অলৌকিক ভাবের মহিমায় সেখানকার জলস্থল পরিপূর্ণ—অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অখণ্ড প্রতাপ সেখানে কি উজ্জ্বলভাবে পরিব্যক্ত! কিম্বা আবার যখন ইংলণ্ডের সেই Westminster Abbeyতে গিয়া দাঁড়াইলাম—সেখানে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যেন মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে স্থানও মহাতীর্থ ভূমি। অমর Shakespeareএর স্মৃতি, Pittএর স্মৃতি যেন আমার মধ্যে কোথা হইতে নূতন জীবন বহন করিয়া আনিল। আবার আমেরিকার সেই লোকবিশ্রুত নায়েগ্রার জলরাশি—সেই শব্দ, সেই প্রাণ, সেই অবিরাম চঞ্চল গতি, সে স্মৃতি জীবনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেছে, তাহা কি আর কখনও ভুলিতে পারিব?

তীর্থযাত্রী যিনি তাঁহাকে আবার তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার ছোট ঘরের ছোট কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। কিন্তু তীর্থ

পর্য্যটনের পর যাত্রী যখন আপনার ক্ষুদ্র গৃহে ফিরিয়া আসেন তখন কি আর তিনি সেই পুরাতন মানুষ থাকেন? যে প্রাচীন যাত্রী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল সে মানুষ আর ফিরে না, জীর্ণ লৌহের শত কলঙ্ক তখন তীর্থের পরশমণি স্পর্শে উজ্জ্বল কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছে। যাত্রী নূতন জীবন লইয়া ঘরে ফিরিলেন, তিনি আপনার ছোট ঘরের নূতন মূর্ত্তি দেখিলেন, চক্ষে তখন তাঁহার সুধার অঞ্জন, চারিদিকে সুধাময় মনে হইতে লাগিল।

ঠিক এমনি সাধুদিগের নিকট গমন—সে ঠিক তীর্থযাত্রার ন্যায়। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট যাই, ঈশার নিকট যাই—আমরা গৌরাঙ্গ বা ঈশা হই না—হওয়া উচিত কিনা তাহাও বলিব না; কিন্তু এও তীর্থযাত্রা। বুদ্ধতীর্থে গমনের কথা ভাবুন। যে জীবনের মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বাস করি, মনের যে পঙ্কিল নগরে আমাদের অধিষ্ঠান, তাহা হইতে বাহির হইয়া যদি একবার বুদ্ধতীর্থে গিয়ে বসি, তবে সেখানকার হাওয়ায় আমাদের নবজীবন লাভ হয়। আমরা বৌদ্ধ হইয়া যাই না, কিন্তু আত্মার স্বাস্থ্য লাভ করি, আমাদের প্রাণে নূতন ভাবের উৎস খুলিয়া যায়। সেই তীর্থে বসিয়া মনে হয় সেই নির্ব্বাণের কথা। সেই অমরবাণী অন্তরআকাশ ধ্বনিত করিয়া উত্থিত হয়—"গৃহকার তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তৃষ্ণা আমার ক্ষয় পাইয়াছে—দুঃখের ভিত্তি উৎপাটিত হইয়াছে।" কি ভাবে এ কথা বলা হইয়াছিল? বুদ্ধের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া দার্শনিকেরা মহাভ্রমে পতিত হন। Dr. Mcdonald প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ শুষ্ক তর্কের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছেন! তাঁহারা বুদ্ধকে "অন্ধকারবাদী" Pessimist বলিয়া বসিলেন! কিন্তু ভাবিয়া দেখুন বুদ্ধদেব যে তৃষ্ণা, যে দুঃখের কথা বলিলেন, সে কাহার তৃষ্ণা, কাহার দুঃখ? সে কি তাঁহার নিজের

জীবনের দুঃখ? কি দুঃখ তাঁহার ছিল? ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতির সন্তান, লক্ষীরূপা সুশীলা পত্নী, সুকুমার হৃদয়ানন্দ পুত্র—কোথায় তাঁহার দুঃখ? অথবা, তিনি কি দুর্দ্দম প্রবৃত্তির অগ্নিতে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া, বাসনা ও তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া, বিরাগভরে কঠোর সাধন গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমরা তো জানি যে, রাজার সন্তান হইয়াও তিনি প্রবৃত্তিকে জয়ই করিয়াছিলেন। বিলাসভবনের সহস্র লাস্যলীলা তাঁহার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তবে কাহার দুঃখের কথা তিনি বলিলেন? সে দুঃখ তাঁহার নিজের দুঃখ নহে—তাহা জগতের দুঃখ, জগতের নরনারীর দুঃখ। মহান-সহানুভূতির ভিতর দিয়া তিনি বিশ্বজগতের দুঃখভারকে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। সেই বাল্যকালে আহত হংসের কথা ভাবুন, সেই বলিদানে মেষের কথা ভাবুন। কি উদার সহানুভূতি! কি সার্ব্বজনীন প্রেম!! আবার ভাবুন সেই গোমতীর কথা—প্রেমবিগলিত হৃদয়ে তিনি গোমতীর শিশুর প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইতেছেন—"আমার প্রাণ দিয়াও যদি ঐ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতে পারি!" বুদ্ধদেব পরের দুঃখকেই নিজের দুঃখ করিয়া লইয়াছিলেন। তার পর তিনি ভাবিলেন—জগতের এ আগুন কি কিছুতেই নিভিবে না? কিসে এ দুঃখের অবসান হয় ইহাই তাঁহার জীবনের সাধনা। এ দুঃখের মূল কোথায়? ইহার মূল—বাসনা, তৃষ্ণা। বুদ্ধ ভাবিলেন, আমি সুখ লাভ করিলাম কিসে? তৃষ্ণা জয়েই সুখ। এই সুখ যদি সকলের হয় তবেই জগতে শান্তি আসে। ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের আগ্রহ। জগতকে এ সুসংবাদ শুনাইতে হইবে, ত্রিতাপ-জর্জ্জরিত নরনারীকে এই সুখের সেতু দেখাইয়া আনন্দলোকের দিকে টানিতেই হইবে। তিনি জগতকে শান্তির অধিকারী করিবেন। এই ত তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। ইহাতে দার্শনিক কচকচির আবশ্যকতা কি? নির্ব্বাণের দার্শনিক

তত্ত্ব আলোচনায় মাথা ঘামাইবার সার্থকতা কি? বুদ্ধ জগতের দুঃখ লইয়া সাধনা করিয়াছিলেন—এই তীর্থ। সেখানকার পুণ্য বাতাস, সেখানকার নির্ম্মল সূর্য্যালোক যদি গায়ে লাগে, তবে নূতন জীবন লাভ করিব না? তাহা হইলে আমাদের জীর্ণগৃহ নূতন হইয়া যাইবে না? আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য শোভায় পূর্ণ হইবে না?

এমনি শ্রীগৌরাঙ্গ তীর্থ। কি সেই আবেশময়ী মত্ততা! সুবিজ্ঞ ডাক্তার হয় তো বলিবেন—চৈতন্য সত্য সত্যই পাগল, সেখানে গিয়া লাভ কি? উন্মাদের উন্মত্ততা হইতে শিখিবার কি আছে? কিন্তু তাহা নহে। সে প্রেমোন্মত্ততায় আমরা কি দেখি? সেখানে বিচার বুদ্ধি ভাসিয়া গিয়াছে—প্রাণ পাগল। কিসে প্রাণ পাগল হইল, কি রূপে তাঁহার মন মজিল? চল না সেই তীর্থে গিয়া বসি, যদি ইহার কিছু আভাস পাই। যে রূপে তাঁহার প্রাণ পাগল সে তো সংসারের কোন রূপ নয়। তবে সে কি? সে কি সমুদ্রের জল, চাঁদের আলো? একজন কি দৃষ্টি পাইয়াছিলেন যে দৃষ্টিতে তিনি সে রূপ দেখিয়াছেন? ভাল, একবার বুঝিতে চেষ্টা করি না কেন, আমাদের এ ক্ষীণ দৃষ্টি সেই দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে মিলাই না কেন, হয় তো এ অন্ধ দৃষ্টির আবরণ খসিয়া যাইতে পারে, হয়তো নয়ন নূতন জ্যোতিঃ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। আমরাও তো সমুদ্র দেখি, চন্দ্র দেখি। কিন্তু পুরীর সমুদ্রে জ্যোৎস্নার আলো প্রতিবিম্বিত দেখিয়া তাহার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিলেন যাহাতে তিনি একেবারে পাগল হইলেন? তিনি বাহিরের সমুদ্র দেখেন নাই, বাহিরের চন্দ্র দেখেন নাই; সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত জলনিধির নিলাম্বু-রাশিতে তিনি দেখিয়াছিলেন সেই নিত্য বৃন্দাবনের অনন্ত-লীলাময় শ্রীহরি। তিনি সংসারকে মায়ার সংসার দেখেন নাই। এই যে রূপরসগন্ধময়ী বাহিরের সুন্দরী প্রকৃতি, এ সেই পরম সুন্দরের ছায়া। তিনি নিজে আরও কত সুন্দর! এই

ভাবে চৈতন্যতীর্থে যাইলে সেই রূপের আভাস লইয়া আসিতে পারি, ইহাতে নবজীবন লাভ হয়। ইহাতে কি জীবনের আদর্শ গড়ে না?

* এমনি ঈশা তীর্থ, এমনি সমুদয় সাধুসমাগম। প্রত্যেক জনের নিকট হইতে কিছু ভাব সংগ্রহ করিলাম, আমাদের আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এখানে কোন সংকীর্ণতার অবসর নাই, এখানে "হিন্দু" "মুসলমান" নাই। ভগবানের সহিত আমাদিগের প্রত্যক্ষ (Direct) সম্বন্ধ, আর সকলের সহিত সম্বন্ধ সাময়িক সম্বন্ধ। বৈজ্ঞানিক সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধ এক সঙ্গে বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম, এই জন্যই শ্রেণী বিভাগ (Classification) করিয়াছেন। কিছুদূর পর্য্যন্ত এই শ্রেণী বিভাগ মঙ্গলকর। কিন্তু ইহা অনিষ্টকর তখন যখন মানব ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব হইতে ইহার প্রতি ব্যবহার করে। বোধ-সৌকর্য্যার্থে তুমি ফুলকে "গোলাপ" "বেল" "পদ্ম" "চম্পক" প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি তুমি গোলাপকে বিলাসিতার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখ তবে ঘোর অবিচার করা হইল। যদি বল কেবল "গঙ্গার" জলই দেবতার, অন্য নদীর কোন মাহাত্ম্য নাই, তবে শ্রেণী বিভাগের মহান্ কুফল ফলিল। হরিদ্বারে তীর্থযাত্রা করিলাম, তীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য ভুলিয়া সেখান হইতে আসিবার সময় পাত্র ভরিয়া তীর্থজল আনিলাম, এরূপ সঙ্কীর্ণতা প্রভূত অনিষ্টের আকর। ঈশার একটী বচন আওড়াইলাম, মনে করিলাম ইহাতেই উদ্ধার; যে ইহা করিল না তাহার ভাগ্যে অনন্ত নরক, ভুল কথা। অনন্ত দেবতার সঙ্গে সকলের নিত্য, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। তুমি করিলে শ্রেণী বিভাগ। তুমি করিলে আমাকে "শূদ্র", উহাকে "ব্রাহ্মণ," তুমি করিলে এক জাতিকে "হিন্দু" আর এক জাতিকে "খৃষ্টান"। এই সব গণ্ডী মানুষের গড়া গণ্ডী—ভগবান এ গণ্ডী করেন নাই। এই সব গণ্ডীই অনিষ্টের মূল। নতুবা সকল পদার্থই আপন আপন স্থানে

পূর্ণ হইয়া আছে—Environments কাল্পনিক নহে real; কিন্তু সেই Environments এর মধ্যে থাকিয়া অনন্তের সঙ্গে প্রত্যেকের নিত্য সম্বন্ধ, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ শ্রেণী বিভাগের কুফল অবশ্যম্ভাবী।

তেমনি সব সাধুতীর্থে গমন; এখানে কোন গণ্ডী না রাখিয়া যাইতে হইবে। আমার প্রাণ যাঁহাকে চায় আমি তাঁহার চরণতলে গিয়া বসিব। আমার আধ্যাত্মিক জগতে ঘুরিতে ঘুরিতে যে মঙ্গলগ্রহ কর্ত্তৃক আমার প্রাণ আকৃষ্ট হইবে আমি তাঁহারই কাছে তীর্থযাত্রা করিব। এইরূপ সাধুসমাগমের মধ্য হইতে নূতন জীবন লাভ করিয়া অনন্তের সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিব।

এক্ষণে আপনাদিগের আলোচনার জন্য আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ইহাই প্রধান চিন্তার বিষয়, Environmentsএর মধ্যে থাকিয়া অনন্তের সহিত এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধকে অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহাই সমাজের গভীর সমস্যা, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন! এ সমস্যা কেবল বৃদ্ধ ও যুবকদিগের সম্বন্ধে নহে, কিন্তু বালকদিগের সম্বন্ধেও। দেশের বালকদিগের কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত, নীতি ধর্ম্ম ইত্যাদি তাহাদিগকে কিরূপে শিখাইবে? আধুনিক শিক্ষায় কিরূপে "জাতি" গড়িয়া তুলিবে? ইহাই দেশের প্রধান অভাব, এ অভাবের পূরণ হয় কিসে? ক্ষুদ্র বালকবালিকাদের নিকট কি আদর্শ ধরিবে—Patriotism বা স্বাদেশিকতার আদর্শ কি? যদি এই গভীর প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা না হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

এই আদর্শ নূতন যুগের নূতন আদর্শ, ইহাই নববিধানের আদর্শ। ইহা কোন অতীত আদর্শ নহে, ইহা পুরাতন আদর্শনিচয়ের কৃত্রিম মিশ্রণও নহে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ। ধীরে ধীরে এই নব আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা হিন্দু আদর্শ নয়, এখানে হিন্দু আদর্শের

ক্রমবিকাশ বলা চলে না, কারণ মধ্যে "তামসযুগ" হইয়া গিয়াছে। এখন আবার নূতন আদর্শ অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতাতেও এই "তামসযুগের" আবির্ভাব হইয়াছিল, সেখানেও আবার নূতন আলোক আসিয়াছে। তবে ইউরোপ নূতন আলোক গ্রহণ করিবার জন্য অধিক প্রস্তুত ছিল, সেই জন্য সেখানে নব আদর্শের বিকাশ পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল। এই নব আদর্শ এসিয়া হইতে ইউরোপে গিয়াছে, কি ইউরোপ হইতে এসিয়ায় আসিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান যুগে অতীত যাবতীয় আদর্শকে রূপান্তরিত করিয়া এক অভিনব মহান্ আদর্শ জগতের সর্ব্বত্রই ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই নব আদর্শের মূল তত্ত্ব কি?

ইহার মূল তত্ত্ব দুই—(১) বিকাশ ও (২) ব্যক্তিত্ব। অথবা বলিতে পারি ইহার মূল মন্ত্র বিকাশযুক্ত ব্যক্তিত্ব। আমাদের দেশে ধর্ম্ম নিবৃত্তির ধর্ম্ম, সংযমের ধর্ম্ম। ঈশার ধর্ম্মেরও প্রথম ভাগ তাহাই, নিয়ম এবং শাসন। নিবৃত্তি ও সংযম ধর্ম্মের পরম সহায় ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভিত্তি গড়িতে হইলে ইহা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্মে নিবৃত্তিই শেষ কথা নহে, এখানে শেষ কথা বিকাশ। ফুলকে ফুটিতে হইলে, তাহাকে নিয়ম সংযম মানিতেই হইবে, নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু ফুলজীবনের সার্থকতা সংযম নহে উহার সার্থকতা বিকাশ। তেমনি মানবজীবন। নিবৃত্তির ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যদি সে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে তবেই তাহার সার্থকতা। কি ইউরোপে, কি এসিয়ায় অতীত এই বিকাশের আদর্শ দিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় কথা—ব্যক্তিত্ব। Ethicsএ উন্নতি—Discovery of the individual,—এ ব্যক্তিকে বোঝা অতীতে হয় নাই। Aristotle, "Natural slaves" ও "Natural mastery"র উল্লেখ করিয়া গিয়া-

ছেন। কিন্তু Stoics সম্প্রদায় আপনাদের সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও জগতকে এক মহান্ শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেক মানুষের Sanctity স্বীকার করিয়াছেন। তাহার পর ঈশার সংবাদ। রোমে পিতা সন্তানের প্রাণদণ্ড করিতে পারিতেন; Spartaতেও এই ভাব। সেখানে ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য একেবারে অস্বীকৃত। কিন্তু ঈশা বলিলেন তাহা নহে। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই তাঁহার সমান আদরের পাত্র। একটি মেষও যদি হারায় তবে সেই একটীর জন্যই স্বর্গে খোঁজ পড়িয়া যায়, কেহই তাঁহার অযত্নের ধন নহে। ব্যক্তিত্বের এই উচ্চ অধিকার, সেই জন্যই আবার প্রত্যেক ব্যক্তির ভগবানের সম্বন্ধে দায়িত্বও অতি গুরু। অধিকার থাকিলেই তাহার সঙ্গে দায়িত্ব জড়িত থাকে। বিশেষ একটী সংসারে, পরিবারে, জাতিতে তোমার জন্ম; কিন্তু তুমি এ সংসারের নও, প্রথম তুমি ভগবানের, তাহার পর অন্য সকলের সহিত সম্বন্ধ। সেই রত্নাকরের গল্প স্মরণ করিয়া দেখুন। ঋষি যখন বলিলেন "রত্নাকর, তুমি যে এই পাপ করিতেছ, এ পাপের জন্য দায়ী কে?" রত্নাকর বলিল "মা বাপের জন্য আমি এই দুষ্কার্য্যে লিপ্ত আছি; অবশ্য মা বাপেও আমার সঙ্গে ইহার জন্য দায়ী।" ঋষি বলিলেন "ভাল, একবার তোমার পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না।" তাহার পর রত্নাকর যখন পিতামাতাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাঁহারা বলিলেন "তোমার কর্ত্তব্য আমাদের প্রতিপালন করা; তাহার জন্য তুমি যে পাপ করিতেছ তাহার জন্য তুমিই দায়ী, আমরা নহি।"

তেমনি তোমার কর্ত্তব্যের জন্য তুমি দায়ী, অন্য কাহাকেও সে জন্য দায়ী করিলে চলিবে না, কারণ সর্ব্বাগ্রে তুমি ভগবানের। বিবাহ ইত্যাদির জন্য সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। তোমার বিবেক অনুসরণ কর, ইহার জন্য সমাজের শাসন তোমাকে বহন করিতেই হইবে, উচ্চ অধিকারের জন্য দায়ীত্বের পীড়ন

সহ্য করিতেই হইবে—Crossকে মাথায় তুলিয়া লইতেই হইবে, ইহাই ব্যক্তিত্বের দায়িত্ব, ইহাই আবার ব্যক্তিত্বের মহান্ গৌরব। এই শিক্ষা সর্ব্বপ্রথম লাভ করিতে হইবে।

তাহার পর, ইহার সঙ্গে বিকাশ। অনেকে ধর্ম্মের নামে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু ধর্ম্ম কখনও মরণ বহন করে না; ধর্ম্মের পুরস্কার বিকাশ। Cross এখানে শেষ কথা নহে, শেষ কথা Resurrection, মৃত্যু নহে—নবজীবন। তা না হইলে ধর্ম্মের মত কঠোর, ভয়ঙ্কর বস্তু আর কিছুই নাই। Crucifixion হইতে গেলেই Judas থাকা চাই, Roman soldiers থাকা চাই। কিন্তু ইহাই কি ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান? Augustine ন্যায়কে (Justice) গৌরবান্বিত করিতে গিয়া বলিয়াছেন "অনন্ত নরকের" (Eternal hell) কথা। কিন্তু নব আদর্শের আলোকে আর কেহ সে কথা বিশ্বাস করেন না। ঈশার ন্যায় ধার্ম্মিক ক্রুশে বিদ্ধ হইবেন! আর ঈশ্বরেরই পুত্র, তিনি Judas হউন আর যেই হউক, তিনিই মারিবেন এই স্বর্গের সন্তানকে? বিধাতার মঙ্গল বিধানে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। ধর্ম্ম মৃত্যু বহন করে না, অনন্ত নরক ন্যায়ের বিধান নহে, বিকাশই ধর্ম্মের বিধান। এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর দাঁড়াইয়া যে পূর্ণ জীবনের আদর্শ—তাহাই Kingdom of Heaven বা নিত্য বৃন্দাবন, যে নামেই উহাকে অভিহিত কর। ইহাই ধর্ম্মের শেষ কথা।

হিন্দু আদর্শে—যোগ, ভক্তি, শান্তি স্বাভাবিক। এ সকল অতি কোমল বস্তু। কিন্তু শুধু কোমলতায় জগতের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কৃষক কোমল কর্দ্দমের সহিত বালুকা মিশাইয়া লয় তবে তাহার মৃত্তিকা কার্য্যোপযোগিনী হয়। তেমনি এই কোমল হিন্দু আদর্শের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে খৃষ্টীয় আদর্শের সুদৃঢ় ভ্রাতৃপ্রেম, যে প্রেমে জাতি গঠিত হয়, State গঠিত হয়। যোগ, ভক্তি, প্রেমের মাধুর্য্যের

সহিত মিলাইতে হইবে বিজ্ঞানের কঠোর তপস্যা, কর্ম্মের অবিচলিত জীবন্ত উদ্যম। এই হিন্দুযুক্ত খৃষ্টীয় আদর্শই জগতের ভাবী আদর্শ।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

বিধান ও নববিধান। *

"বিধান" কি? ইহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে "নববিধান" কি, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

নববিধানের দুইটী বিশেষত্ব আছে—(১) ইহা জাতীয়; (২) ইহা বিশ্বজনীন। লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু বিধান বলিলে যে একটী নূতন আলোক লাভ করা যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সে আলোক দান করে না।

যদি জিজ্ঞাসা করি জাতীয় ধর্ম্ম কি, তাহা হইলে কি উত্তর পাই? কেহ কেহ বলেন, ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম তাহাই যাহা বেদ বেদান্তের ভিত্তিতে স্থাপিত। যদি জাতীয় ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম, যাহা বেদের ভিত্তিতে স্থাপিত নয়, তাহা এই জাতীয় আখ্যা হইতে বাদ পড়িয়া যায়। এমনি আরো কতকগুলি ধর্ম্ম বাদ পড়ে। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন—যা কিছু ভারতে ধর্ম্ম নামে প্রচলিত তাহাই জাতীয় আখ্যার অধিকারী। কিন্তু ইহাই কি জাতীয় ধর্ম্মের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা? অসংখ্য ধর্ম্ম-বিজড়িত ভারতের জাতীয় ধর্ম্মের মীমাংসা কিরূপে সম্ভবপর? ব্রাহ্মধর্ম্মকে

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৯১০ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে উদ্ভাসিত।

যদি জাতীয় ধর্ম্ম বলা হয় তবে দেখিতে হইবে উহা জাতীয় কি অর্থে ?

ইহা কুসংস্কারশূন্য হিন্দুধর্ম্ম, এই অর্থে জাতীয় ? অথবা, ইহা স্বাভাবিক জাতীয় সংস্কারের ভিত্তিতে স্থাপিত বলিয়া জাতীয় ধর্ম্ম ? এ বিষয়ে কিছু স্থির করিয়া বলা সুকঠিন।

এই কঠিন সমস্যার অন্ধকারে বিধান আমাদিগকে আলোক দান করে। জাতীয় বিধান বলিলে এই অর্থ বুঝায়—*A Vidhan* or Dispensation that will make a nation of us—একটী বিধান যাহা আমাদিগকে একটী অখণ্ড জাতিতে গড়িয়া তুলিবে। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে "জাতীয়তার" ভাব ছিল না; কিন্তু এখন, সময় আমাদের মধ্যে এই জাতি হইবার উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষা আনিয়াছে। কেশবও এই কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—জাতীয় বিধান এক নূতন আদর্শের আলোক আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে—এ বিধান পুরাতনকে transform বা রূপান্তরিত করিয়া এক নূতন জাতি গড়িয়া তুলিবে।

তার পর দেখা যাউক, বিধান universal বা সার্ব্বজনীন কি অর্থে ? ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, এ ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, কারণ ইহার মূল মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত। মানুষ মানুষ বলিয়া যে ধর্ম্ম চায় ইহা সেই ধর্ম্ম। কিন্তু এ ভাবে দেখিতে গেলে ইহা হইতে ক্রমবিকাশ বাদ পড়িয়া যায়। বেদের সময়েও মানুষ ছিল, এখনও আমরা মানুষ। কিন্তু সেই বৈদিক যুগ হইতে এই বিংশ শতাব্দী কত বিভিন্ন। মানুষের ভাব, ভক্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা কত রূপান্তরিত। বিশ্বজনীনের এরূপ ব্যাখ্যা করিলে—ইহা মানবীয় প্রকৃতির সাধারণ বস্তু হইতে পারে—কিন্তু ইহা আর উন্নতিশীল থাকে না। ইহাই এ ব্যাখ্যার পথে প্রধান অন্তরায়।

কিন্তু যদি বলি বিশ্বজনীন বিধান, তাহা হইলে ক্রমোন্নতিকে বাদ দেওয়া হয় না। ক্রমবিকাশের প্রণালী সমস্ত জগতের লোককে লইয়া এক নব অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নববিধান এই ক্রমবিকাশের বর্ত্তমান চরম বিকাশ।

এইবার আলোচনা করিতে হইবে—বিধান কি? অনেকেই কেশবচন্দ্রের Yoga—Subjective and Objective পাঠ করিয়াছেন। ঈশ্বরানুভূতির ৩টী সোপান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—(১) প্রকৃতিতে ঈশ্বর (God in nature); (২) আত্মায় ঈশ্বর (God in soul); (৩) ইতিহাসে ঈশ্বর (God in history)। প্রথমটী Objective Yoga; দ্বিতীয় Subjective Yoga; তৃতীয়টী Yoga Universal। কেয়ার্ড (Caird) ও তাঁহার বিখ্যাত Evolution of Religion (ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ) গ্রন্থে বিকাশের এই তিন পর্য্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতিতে ঈশ্বর—এই সোপানে বিধানের ভাব প্রকাশিত হয় নাই। আত্মায় ঈশ্বর—এখানেও বিধানের ভাব সূচিত নহে। কিন্তু ইতিহাসে ঈশ্বর—এইখানে বিধানের ভাব পরিস্ফুট।

সুবিখ্যাত দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে ত্রিবিধ বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন:—(ক) Ætiological বা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ। জগতের কার্য্য দেখিয়া আমাদের মনে কারণ বা কর্ত্তার অস্তিত্বের কথা উদিত হয়। আমাদের বেদ এই ভাবপ্রণোদিত।

(খ) Cosmological—জগৎ ক্ষণস্থায়ী, অপূর্ণ, মায়া, অসৎ, মিথ্যা। কিন্তু এই অপূর্ণই মনে করাইয়া দেয় পূর্ণের কথা, পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণস্থায়িত্বের পশ্চাতে এক চিরস্থায়ী নিত্য সত্তা বিরাজিত। উপনিষদে এই ভাব সূচিত হইয়াছে। উপনিষৎ বলিতেছেন—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ অস্থায়ী, অসৎ; ইহাদের অতীতে এক চিরন্তন সৎ বস্তু আছেন—তিনিই ব্রহ্ম।

(গ) Teleological—(উদ্দেশ্যমূলক)। এই বিচিত্র সৃষ্টি ব্যাপারের এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে—ইহা মায়ার খেলা নহে, ইহা মিথ্যা প্রবঞ্চনা নহে। "One, far off Divine event to which the whole creation moves" এইখানেই বিধানের ভাব পরিস্ফুট।

Principal Carpenter গত মাঘোৎসব উপলক্ষে লণ্ডনে ১১ই মাঘ তাঁহার 'East and West religions compared,' নামক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—পূর্ব্বদেশে Monism অর্থাৎ একত্ববাদতত্ত্ব, পরিষ্কার ও পরিস্ফুট। Law of Karma—অর্থাৎ কর্ম্মফলতত্ত্বও সেখানে পরিস্ফুট। কিন্তু এ সকলই ব্যক্তিগতভাবে। পূর্ব্বদেশে —Social Religion ; ধর্ম্ম যে কেবল ব্যক্তিগতসম্পত্তি নহে, কিন্তু ইহা জাতিগত অমূল্য সম্পদ, সমগ্র জাতির মর্ম্মস্থল বহিয়া এই ধর্ম্মের শান্ত ধারা প্রবাহিত না হইলে যে জাতির কল্যাণ কখনও সম্ভবপর হয় না—এভাব পূর্ব্বে পরিস্ফুট হয় নাই। কেহ আপত্তি করিতে পারেন—ইহা কিরূপ কথা? যে ভারতের অনশন, বসন, বিবাহ, উপনয়ন—ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানই ধর্ম্মময়, সেখানে এ কথা কিরূপে খাটে? কিন্তু বাস্তবিক একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এখানে সকল সাধনই ব্যক্তিগত সাধন। জাতীয় বিধানের ভাব এখানে ফোটে নাই। এই ভাব সর্ব্বপ্রথম ইহুদিরা জগতকে দান করিয়াছেন। তাঁহাদেরই মধ্যে প্রথম এই ভাব দেখা যায় যে—এক মহান্ নেতা সমগ্র জাতির নিয়তিকে চালিত করিতেছেন। New Testamentএ এভাব আরও উদার আকার ধারণ করিয়াছে। যে জাতির সীমা পূর্ব্বে Gentilesদের বাদ দিয়া কেবল Jewsদের মধ্যে বদ্ধ ছিল, তাহাই New Testamentএর সময় হইল—Kingdom of Heaven—সমগ্র মানব জাতি তখন ইহার বক্ষে স্থান লাভ করিল। ইহাই Dispensation বা বিধান এবং Covenantএর

ভাব। Carpenter বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের এই ভাবটী নাই। এখানে সাধক ভগবানকে রসস্বরূপ আনন্দময়রূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ঈশ্বর এই জগতের শাসনকর্ত্তা—সকল বস্তুই তাঁহার অখণ্ড শাসনের অধীন এ ভাবও বেশ পরিস্ফুট। কিন্তু ভগবান যে জাতীয় জীবনে বিধাতা—তিনি যে জাতীয় নিয়তিকে এক ধ্রুবলক্ষ্যের দিকে চালিত করিতেছেন—এ ভাব ভারতবর্ষে নাই!

আবার এখানে কেহ বলিতে পারেন—কেন, গীতায় তো এই জাতীয় নিয়তি পরিচালনার ভাব স্পষ্টই দেখা যায়। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।......সম্ভবামি যুগে যুগে।" অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এখানে বিধানের ভাব আছে—কিন্তু সে ভাব অঙ্কুর অবস্থায় আছে। অবতারবাদতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ভগবান কখ'ন ধরাধামে অবতীর্ণ হন?—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি"—যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত—যখন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, কেবল তখনই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে ভগবান অবতীর্ণ। প্রলয়ের দুর্দ্দিনে তিনি অবতীর্ণ বিধাতা পুরুষ! কিন্তু তিনি যে Historyতে বিধাতা—এ ভাব পরিস্ফুট নহে। বস্তুতঃ ভারতে Historyর কোন ভাব ছিল না, সুতরাং এখানে Social Evolution বা সামাজিক অভিব্যক্তিবাদেরও কোন ভাব ছিল না। আমাদের দেশ কেবল চিরন্তন সত্যটুকু লাভ করিতেই ব্যাকুল, কিন্তু কাহার ভিতর দিয়া সেই সত্য বিকাশ প্রাপ্ত হইল—কোন্ পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সেই সব ফুটিয়া উঠিতেছে—ইহা কখনই ভারতের ভাবনার বিষয় হয় নাই। কিন্তু ইতিহাসের গৌরব এইখানেই—ইহা কেবল চিরন্তন সত্য লইয়া সন্তুষ্ট নহে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির বিকাশ সাধিত হইতেছে, ইহা সেই সকলকে আপনার ভাবনার বিষয় করিয়া লইয়াছে।

ইহা দেখাইতে চায় যে, এই জগত, সৃষ্টি বিধাতা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া এক মহৎ উদ্দেশ্যের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু কি এই উদ্দেশ্য ?—সে তত্ত্ব অতি গভীর—এ উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠাই কঠিন। চিন্তাশূন্যভাবে এই উদ্দেশ্যের কথা বলা সহজ—কিন্তু ইহা অতীব দায়িত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক। অনেকেই সেই মাতালের গল্পটী জানেন। মাতাল Oak বৃক্ষ দেখিয়া বিধাতার 'ওক' সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়াছিল—মদের বোতলের সুন্দর ছিপি হইবে বলিয়াই Oak এর সৃষ্টি! দায়িত্বশূন্যভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলেই এইরূপ স্বার্থপর ব্যাখ্যা অবশ্যম্ভাবী। আমরা শুক্ল যামিনীর সুধাময় পূর্ণচন্দ্রকে আকাশ আসনে বসিয়া হাসিতে দেখি, আবার অমা-নিশিথিনীর দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশিকে জগতের বক্ষে পাথরের ন্যায় চাপিয়া থাকিতেও দেখি—এখন কে বলিবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী বিধাতার উদ্দেশ্য। হিমালয়ের শুভ্র তুষার উদ্দেশ্য, না আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উদ্দেশ্য ? নিশ্চল শান্ত সমুদ্রের অগাধ গাম্ভীর্য্য উদ্দেশ্য, না ভীষণ তরঙ্গ তুফানের ভীম আবর্ত্ত উদ্দেশ্য ? বলা কঠিন।

কিন্তু যদি আমরা জড় প্রকৃতি ছাড়িয়া জীবনের রাজ্যে আসিয়া উপনীত হই—তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা থাকে না। যদি জীবন থাকার উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। জড় জগতে উদ্দেশ্য বিষয়ের কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুদুষ্কর, কিন্তু Organic World বা জীবনের রাজ্যে এ উদ্দেশ্য নিঃসন্দিগ্ধ এবং অপরিহার্য্য।

কিন্তু Organism কি কেবল দেহ ? পরিবারও কি Organism নয় ? যেমন দৈহিক জীবন, ঠিক তেমনি পারিবারিক জীবন—আবার ঠিক তেমনি সামাজিক জীবন। কিন্তু এ সকলের অপেক্ষা বড়—

সমগ্র মানবজাতির জীবন। এই জীবনের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলে ভগবানের বিধাতৃত্ব সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ; সমাজের সমষ্টি—জাতি; এবং জগতের বিভিন্ন জাতি একই অখণ্ড মানববংশের বিভিন্ন অংশ মাত্র। সকল অংশই সমগ্রের সঙ্গে এক জীবন্ত সম্বন্ধ সূত্রে গাঁথা। যদি ব্যক্তিগত জীবনে বিধাতার উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন দ্বিধা না থাকে, তবে সমগ্র মানববংশের নিয়তি পরিচালনা বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকে না। এখানে Teleology পরিষ্কার। বিধান এই অখণ্ড নরবংশ ও ইহার মধ্যে বিধাতার অভ্রান্ত পরিচালনার ভাব লইয়া বিশ্বের দুয়ারে উপনীত।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে সংঘর্ষ ও সম্মিলন।*

এই বিষয়টী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থিত হয়ঃ—

(১) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলিয়া বিভিন্ন আদর্শ আছে কি না। সমগ্র মানবজাতির আদর্শ আছে, বিশেষ বিশেষ মানবে ও বিশেষ বিশেষ জাতিতে এ আদর্শ বিভিন্ন। কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আদর্শ এক ছাড়া কি স্বতন্ত্র? আদর্শ একই, তবে কোথাও তাহা অধিক উজ্জ্বল, আবার কোথাও বা তাহা অপেক্ষাকৃত ম্লান। কোন জাতিতে সমধিক বিকশিত, কোন জাতিতে অল্প অভিব্যক্ত এই মাত্র প্রভেদ।

(২) যদি দুইটী আদর্শই থাকে, তবে তাহাদের মিলন কি সম্ভবপর? এবং এরূপ মিলনের আবশ্যকতাই বা কি? যে যে কারণের সমবায়ে

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৯১০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে উদ্ভাসিত।

আদর্শ বিভিন্ন হইয়াছে সেই সেই কারণেই চিরদিন উহারা বিভিন্ন থাকিবে! তাহাদের মধ্যে মিলন কখনও সংসাধিত হইবে না।

(৩) এই বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে কোথাও কি সংঘর্ষ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে তবে উহা কি প্রকারের সংঘর্ষ? অনেকে মনে করেন যে, দুইটী আদর্শ যে শুধু বিভিন্ন তাহা নহে, উহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে উহাদের ভয়ঙ্কর বিরোধ ও সংঘর্ষই উপস্থিত হইবে, মিলন কদাপি সম্ভবপর নহে। অধুনা ভারতে যেন এইরূপই পরিলক্ষিত হইতেছে। সেইজন্য ইঁহারা বলেন—"পশ্চিমের" আদর্শ "পশ্চিমেরই" থাকুক, "পূর্ব্ব" যদি তাহা গ্রহণ করে তবে তাহার সমূহ অনিষ্ট হইবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম আপন আপন আদর্শ লইয়া চলুক।

(৪) পশ্চিম জগৎ কি? পূর্ব্ব জগৎ কি? ভিন্ন আদর্শ কি? মানুষ সুবিধার জন্য ভূগোলের বিভাগ করিয়াছে। কিন্তু নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজেও কি সেই কৃত্রিম বিভাগ মানিয়া চলিতে হইবে?

এখন বিষয়টীর বিভাগ সম্বন্ধে আমি প্রথমেই একটী কথা বলিয়া লই। "পাশ্চাত্য আদর্শ" অর্থে আমি বলিয়াছি—আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান জীবন ও সভ্যতার আদর্শ। আর "প্রাচ্য আদর্শ" বলিলে চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের আদর্শও বুঝিতে হয়। কিন্তু আমি সে অর্থে ইহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি "প্রাচ্য আদর্শ" অর্থে বুঝিয়াছি—ভারতবর্ষের আদর্শ। আর একটী কথা, পাশ্চাত্য আদর্শে আমি এখনকার দিনে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার আদর্শ কেন বলিলাম? তাহার কারণ পাশ্চাত্য আদর্শ জটিল বস্তু, ইহাতে অনেক জিনিষ মিশিয়াছে। এ সকলের মধ্যে আবার অনেক উপাদান "পূর্ব্ব" হইতে গিয়াছে। ঈশার ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতে যাইয়া সেখানে মিশিয়াছে ও সেখানকার জাতীয় ধর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে—পশ্চিমের বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শ। সুতরাং

"পাশ্চাত্য আদর্শ" কথাটা ব্যবহার করা ঠিক নহে, কারণ এ আদর্শের ক্রমবিকাশে "পূর্ব্বের"ও বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। অতএব এ বিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত নহে। তবে পশ্চিমের আদর্শের সহিত অনেক উপাদান মিলিত হইয়া সেখানে আদর্শের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে এই অর্থে আমরা "পাশ্চাত্য আদর্শ" বলিতে পারি।

এইবার পূর্ব্বোত্থাপিত প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে বিচার করা যাক্।

যখন আমি পশ্চিমে (আমেরিকা) ছিলাম, তখন সেখানে আমি লোকবিশ্রুত নায়েগ্রা জলপ্রপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। উজ্জ্বল জলরাশি দিবারাত্রি অবিরাম ধারায় নিপতিত হইতেছে। নির্ম্মল জলধারার উপর সূর্য্যের কনকরশ্মি পতিত হইয়া কত অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হইয়াছে; কি তাহার তীব্র বেগ, কি তাহার ভৈরব গর্জ্জন! মনে হয় প্রকাণ্ড শক্তি সেখানে অবিশ্রাম ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার মনে হয়—এই তীব্র নদীর উচ্ছ্বাসের মধ্যে কি শান্তি আছে? না, কেবলই উদ্বেগ, কেবলই বেদনা? শুধুই উদ্দাম চঞ্চলতা, যাহা কখনও স্থির হইতে দেয় না? আবার ইহারই সঙ্গে মনে হয় তদ্দেশবাসী লোকের জীবন। সে তো সেই Niagra জলস্রোতের মতই অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে! সেখানে কেবলই কর্ম্ম, কেবলই উদ্যম, কেবলই পরিশ্রম, কেবলই অস্থিরতা!

সেখানে বিরাম নাই—নিদ্রা নাই। কি ভীষণ অশান্তি, কি তীব্র উদ্বেগ! সেখানকার নরনারী যেন বিশ্রামকে কোথায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে—তাহারা চায় অনন্ত কর্ম্মকোলাহলের অস্থির মাদকতা। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম লইয়াই তাহারা সদা ব্যস্ত—তাহাদের আহার পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। "চলা" তো বিশ্রামের অভাব; পাশ্চাত্য জগতে এই অবিরাম গতি—সেখানে বিশ্রাম কোথায়, শান্তি কোথায়? আবার Parliamentএর কথা ভাবিয়া দেখুন। মনে

করুন Budget আলোচনার সময়। দিনের পর দিন, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কতই বক্তৃতা, কত সমালোচনা, কি ভীষণ বাক্‌যুদ্ধ! Punch পত্রিকায় ছবি বাহির হইল—Asquith, Balfour প্রভৃতির চক্ষু নিদ্রাতে ঢুলু ঢুলু, মস্তকের নিকটে ভীষণ দৈত্য দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছে "Sleep no more!" সিংহাসনলোলুপ উদ্দাম-প্রকৃতি Macbeth নৃপতি Duncanকে যখন হত্যা করিয়াছে তখন বিষাদ-ময়ী প্রকৃতির মর্ম্মস্থল হইতে এই তীব্র অভিশাপবাণী ধ্বনিত হইয়াছিল—"Macbeth hath murdered sleep, Macbeth shall sleep no more, Duncan shall sleep no more"—কি তীব্র অশান্তির দহন! ইঁহারাই তো প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা, কিন্তু ইঁহাদের সে শান্তিটুকু পর্য্যন্ত নাই, যাহা সামান্য কৃষকেরও আছে! এই তো পাশ্চাত্য আদর্শ! এই আদর্শে তো সেই Niagaraরই উদ্দাম চঞ্চলতা! কিন্তু এ তো গেল কর্ম্মের সম্বন্ধে। তাহার পর আবার আমোদ, উৎসবের কথা ভাবুন। Paris, London প্রভৃতি সহরে আমোদের জন্য রাত্রির পর রাত্রি Dance, Ball চলিয়াছে। দিবসে সেই যামিনীর শ্রান্তির অবসাদ—সে কি নিদ্রা? পাশ্চাত্য জগতের আমোদ উৎসবও সেই Niagaraরই উন্মত্ত স্রোত! এখানে শান্তি কোথায়? আর ইহা আকস্মিক বা নিয়মের ব্যতিক্রমও নহে—তাঁহারা তো ইহাই চান, ইহাই সেখানকার আদর্শ।

আর এক দিক আছে। আমেরিকা বাসকালে দেখিয়াছি সেখানে প্রতিদিন জাহাজে করিয়া ইউরোপের নানা দিক দেশ হইতে ৮০০।৯০০ Emigrants আসিতেছে। ইহারা নির্ধন, অশিক্ষিত, সমাজের অতি নিম্নস্তরের লোক। কিন্তু আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই ইহারা Universal suffrage লাভ করে—Governmentএ পর্য্যন্ত vote দিবার ইহাদের অধিকার আছে। আমার এক বন্ধু আমাকে প্রশ্ন

করিয়াছিলেন—এই যে সব ঔপনিবেশিক দলে দলে এখানে আসিতেছে ইহারা তো অজ্ঞান মূর্খ, আর এখানে আসিবামাত্রই ইহারা নাগরিকের পূর্ণ অধিকার লাভ করিতেছে—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কিরূপে দেশে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়? ইহার একমাত্র মীমাংসা আমেরিকার System of Education—শিক্ষা পদ্ধতি। বাস্তবিক সেখানে শিক্ষার কি সুন্দর বন্দোবস্ত! সেখানে শিক্ষা অবৈতনিক—কিন্তু সকলেই শিক্ষা করিতে বাধ্য (Compulsory) শিক্ষার্থীর আরামের জন্য, সুখ সুবিধার জন্য কি বিপুল আয়োজন! সকল লোকের সন্তানকেই এক প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, যেন এক ছাঁচে ঢালিয়া সকলকে এক করিয়া লওয়া হয়। সকলেই Citizenshipএর আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকাতে অশিক্ষিত কেহই নাই। আবার যাহারা প্রকৃতির বিকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের দুর্দ্দশা বিমোচনের জন্যই বা কি সজাগ চেষ্টা, কত সুন্দর ব্যবস্থা! মূক, বধির ও Imbecileদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত! এই সকল লোক প্রকৃতির অধিকারে বঞ্চিত বলিয়া মানুষের অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে কেন? তাহাদের দৈন্য বিমোচনের জন্য অত্যন্ত উদ্যম—ইহাই পাশ্চাত্য আদর্শ। Niagara জলপ্রপাতের বিপুল চঞ্চলতাই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই যে অনন্ত উদ্যম ইহা কি প্রকৃতই শান্তিহারা? না, ইহা পূর্ণ গতি, যাহা পূর্ণ শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে? এই পৃথিবীও তো অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিতেছে, কিন্তু এখানে অশান্তি কোথায়? যাহাদের আদর্শ এই সকলকে তুলিয়া ধরিয়া উচ্চ আদর্শের অধিকারী করিতে হইবে, তাহারা কি Niagaraর আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে না লইয়া থাকিতে পারে? এ উচ্ছ্বাস তো শক্তির আনন্দ! Niagaraর যে সুগম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি

উহাই তো আনন্দের সঙ্গীত! চঞ্চলতাই প্রাণের লক্ষণ, উহাই গভীর আনন্দ। মনীষী Whit-man বলিয়াছেন Weaver, Shoe-maker যে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে গান করিতেছে, উহাই তো কর্ম্মের বিমল আনন্দ। তিনি কর্ম্মীর ললাটের স্বেদবিন্দুতে আনন্দের নির্ম্মল জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়াছেন, এই তাঁর Vision।

অতএব আমরা দেখিতেছি পাশ্চাত্য আদর্শ—অবিরাম গতি—অনন্ত কর্ম্মোদ্যম; জীবনের বিকাশে সকলকে অধিকারী করিবার বিপুল প্রয়াস।

এইবার ভারতের আদর্শের কথা। কিন্তু প্রথমে সংঘর্ষের কথাই একটু ভাবিয়া দেখা যাক।

আমরা ভারতবাসী ছিলাম নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ চাঞ্চল্যবিহীন। পাশ্চাত্যজাতি আসিয়া আমাদের এই শান্তি, এই নিশ্চিন্ততাকে যেন একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। দুইটী অন্ন নাকে মুখে গুঁজিয়া আফিসে দৌড়াদৌড়ি করা, ইহা ভারতে কোথায় ছিল? এখানে ছিল আরাম, ছিল অপার শান্তি। সকালে ঠাণ্ডার সময়ে কাজ, দ্বিপ্রহরের উত্তাপে গৃহের মধ্যে নিদ্রা, আবার সায়ংকালের স্নিগ্ধতায় কর্ম্ম, তাহার পর বিরামদায়িনী রজনীর ক্রোড়ে পূর্ণ বিশ্রাম! এই ছিল ভারতের আদর্শ। কোথা হইতে ছুটাছুটি আসিয়া জুটিল, উদ্বেগকর মত্ততা সকলের জীবনকে যেন তোলপাড় করিয়া দিল। এখন গৃহে গৃহে স্বাস্থ্যভঙ্গ, সকলের মুখেই পরিপাণ্ডুর বিবর্ণতা, শান্তি কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে! এইরূপ অনেক অশান্তির কারণ ভারতে আসিয়া জুটিয়াছে, এ ভয়ানক সংঘর্ষ প্রত্যেক পরিবারেই প্রবেশলাভ করিয়াছে। তারপর আদর্শের কথা। আমাদের দেশের আদর্শ কোথায় আমরা পাই?

(ক) ঋষিদিগের আশ্রমে, শান্ত তপোবনে। (খ) গ্রামে।

ঋষির তপোবন নিত্য শান্তির লীলাভূমি। সেখানে ঋষিরা প্রাণের পূর্ণোচ্ছ্বাসে বেদগানে নিরত। যোগ ধ্যানের অগাধ শান্তিতে সেখানকার আকাশ পরিপূর্ণ। সাংসারিক চিন্তা, বিষয়বাসনা, উপার্জ্জনের দ্বন্দ্ব সেখান হইতে নির্ব্বাসিত। ইহা ঋষি ও যোগীর আদর্শ। অবশিষ্ট লোকের আদর্শ—গ্রামে। গ্রাম লইয়াই ভারতবর্ষ। রাজা থাকেন সহরের মধ্যে এই মাত্র, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক কি? Village communityই প্রকৃত শাসক; চতুষ্পাঠি, মন্দির প্রভৃতিই প্রকৃত ব্যবস্থাপক সভা। তাহার পর বর্ণাশ্রম। শূদ্র, বৈশ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের লোক আপন আপন কর্ম্ম করিতেছে, সেখানে নিত্য অতিথিসেবা হইতেছে, প্রতি পরিবারে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত। লোকে চিন্তা করিতে চায় না, চায় স্থিরতা, চায় শান্তি। রাজার সঙ্গে সম্পর্ক কি? যদি তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ হয়, তবেই তাঁহারা রাজার নিকটে সাহায্যার্থে গমন করেন। রাজা দেশের শান্তিরক্ষক এই পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য। ভারতবর্ষময় এই গ্রাম। অল্পদিন হইল যে census গৃহীত হয় তাহাতেও স্থিরীকৃত হয় যে সমগ্র ভারতে মাত্র ১৯।২০টী নগর (city), অবশিষ্ট সমুদায়ই গ্রাম। এই সকল গ্রাম আপনাতেই আপনারা সম্পূর্ণ। তাহারা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য—নিজেদের অভাব পরিপূরণের যাবতীয় ব্যবস্থাই সেখানে আছে—সুশৃঙ্খলভাবে সকল কর্ম্মই সংসাধিত হইতেছে! ভারতবাসীর এই সন্তোষ, এই শান্তি। কেবল তীর্থযাত্রার উপলক্ষে ভিন্ন দেশ দর্শন হইয়া থাকে, নচেৎ গ্রামের বাহিরে যাইবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

ইহাই ভারতের আদর্শ এবং ইহাই সে আদর্শের ভাল দিক। কিন্তু যেমন ইউরোপের সম্বন্ধে "Sleep no more", তেমনি ভারতের এই অপার সন্তোষে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—সঙ্কীর্ণতা। এবং এই সঙ্কীর্ণতার শোচনীয় পরিণাম—নিরাশ্রয়তা। দুর্ভিক্ষ, মহামারী

প্রভৃতি প্রকৃতির পীড়নে ভারতবাসী একান্ত দুর্ব্বল ও অসহায়; পিতা মাতা একেবারে প্রতিবিধানাক্ষম, নিরাশ্রয়! তাহারা চক্ষুর সম্মুখে প্রাণাধিক পুত্র কন্যার মৃত্যু সন্দর্শন করে, কিন্তু হায়! তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই তাহারা করিতে জানে না।

লুপলাইনে Murarai ষ্টেশনের নিকট যেবার প্রবল বন্যা হয়, সেবার বন্যাপীড়িত দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ কলিকাতা হইতে কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া পাঠান হইয়াছিল। আমরা সেখানে গিয়া দেখিলাম, গৃহশূন্য শত শত লোক অনাহারে তরুতল আশ্রয় করিয়া হাহাকার করিতেছে, তাহারা কেহই চাউল সাহায্য পায় নাই। অনুসন্ধানে জানা গেল চাউল তত্রত্য দারোগার নিকটেই রহিয়াছে, তখনও বিতরণ করা হয় নাই। অবশ্য এ বিষয়ে দারোগার যে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, স্বীকার করি, কিন্তু দুঃস্থ ব্যক্তিরাও এরূপ জড়ভাবাপন্ন ও নিশ্চেষ্ট যে তাহারা অসহায়ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অনশনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছে, তথাপি কেহই সচেষ্ট হইয়া দারোগার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হয় নাই। এমনি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে দারুণ জলকষ্টে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু গ্রামের লোক যে সমবেত চেষ্টায় একটি পানীয়জলের পুষ্করিণী খনন করিবে সে উদ্যম কাহারও নাই, সকলেই নিরাশ্রয়-নির্ভরতার সহিত "যা করেন অদৃষ্ট" বলিয়া দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অন্য দেশ হইলে এরূপ অবস্থায় দেশে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়া যাইত, কিন্তু এখানে তাহা হয় না, নিরাশ্রয় মানব নীরবে মৃত্যুর মাঝে জীবন সমর্পণ করে।

আর এক কথা বর্ণাশ্রম বিভাগের শোচনীয় পরিণাম। শূদ্রদের এখানে কোন অধিকার নাই, ইহার ফলে সকল প্রকার উদ্যম ও চেষ্টা নির্ব্বাপিত। মানুষের পরম গৌরব যে আত্ম-নির্ভরতা—সে

স্বাবলম্বন এককালে তিরোহিত—আত্মসম্মান-জ্ঞান বিলুপ্ত—নরনারী মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

সংক্ষেপে ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ-চিত্র। পাশ্চাত্য আদর্শের কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই দুই আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গভীরতর স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলে কি আদর্শের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়? না, এই ভিন্নতা শুধু Circumstancesএর ভিন্নতা নিবন্ধন। অবশ্য মনুষ্যত্বের আদর্শই শুভ-আদর্শ। কিন্তু এই মনুষ্যত্বের আদর্শকে ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়াছে, সুতরাং মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয়েও ঐক্য অসম্ভব। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টী উজ্জ্বল হইবে। ভারতের আদর্শ—মানুষের অভাবকে যতদূর সম্ভব কম করিয়া ফেল। পশ্চিমের আদর্শ—মনুষ্যের অভাবকে পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হও। অবশ্য অভাবকে সংক্ষেপ করার আদর্শ পশ্চিমেও আছে। মনীষী Carlyle মানুষের জীবনকে ভগ্নাংশ (Fraction) রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভগ্নাংশের "হর" (Denominator) আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, তৃষ্ণা। ভগ্নাংশের Denominatorকে কমাইলে ঐ ভগ্নাংশের মূল্য বর্দ্ধিত হয়; যখন Denominator শূন্য (Zero) হয়, তখন উহা Infinityর সমান হয়। মানব জীবনরূপ ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও এই কথা। যদি ইহার Denominator অর্থাৎ, বাসনা ও তৃষ্ণাকে সংক্ষেপ কর, মানব-জীবনের মূল্য বাড়িয়া যায়। যখন এই Denominator, Zero হয় অর্থাৎ যখন হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ বাসনার বীজ উন্মুলিত হয়, তখন মানবজীবনের মহত্ত্ব অনন্ত হইয়া উঠে। তখন তোমার কোন সম্পদ না থাকিলেও তুমি রাজ-চক্রবর্ত্তী, মহীপতি হইতেও মহীয়ান্। কেবল এক আত্মার সম্পদ লইয়া তখন তুমি জগতের যাবতীয় সম্পদের উর্দ্ধে স্থাপিত। ইহাই

ভারতের আদর্শ। বুদ্ধদেব এই আদর্শ এখানে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তৃষ্ণাকে জয় কর, তাহা হইলেই নির্ব্বাণ বা মোক্ষলাভ হইবে। মুনিঋষি ও তপস্বীগণ দীন আশ্রমে বাস করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতে সহস্রগুণে সুখী।

আবার তপোবনের কথা ছাড়িয়া যদি বর্ণাশ্রমের কথাই ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা কি দেখি? বর্ণাশ্রমেই মনুষের কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত নহে, শেষ লক্ষ্য, "বাণপ্রস্থ" অবলম্বন। সংসার কর, কিন্তু সংসারে থাকিয়াই অল্পে অল্পে বাসনাকে সংযত ও খর্ব্ব করিয়া আন; শেষে তোমাকে বনে যাইতে হইবে; সেখানে বাসনা = O অর্থাৎ একেবারে নির্ব্বাপিত।

পশ্চিমে, আদর্শে—Numeratorকে বর্দ্ধিত কর। অভাবকে বাড়াইয়া তোল এবং এই অভাবকে পূর্ণ করিবার জন্য Produce অর্থাৎ সৃজন কর, উপার্জ্জন কর। জীবনের বল, শক্তি কোথা হইতে আসিবে? অভাববোধ হইতেই শক্তি উপার্জ্জিত হয়। যদি এ অভাববোধ না থাকে তবে উপার্জ্জন করিতে পারিবে না, নূতন কিছুই সৃজন করিতে পারিবে না। আবার অভাববোধ হইতে যেমন উপার্জ্জন, তেমনি উপার্জ্জন হইতে নূতন অভাববোধের সৃষ্টি। এই নূতন অভাববোধ হইতে আবার নূতন সৃষ্টি। এইরূপেই জগতে উন্নতি, ইহাতেই জীবনের উৎসাহ, বল, অধ্যবসায়; ইহাতেই প্রাণের প্রাণত্ব। ইহাকে Mammon Worship বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না, ইহা অর্থের পূজা নহে, অর্থ সঞ্চয় নহে। America, Europe ধন রত্নকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে না, তাহারা অর্থকে Bankএ খাটায়, তাহা হইতে নূতন সৃজন করে। সেখানে টাকার অর্থ, মান নহে; টাকাকে তাহারা আরামদায়ী বস্তু বলিয়াই বুঝে। পাশ্চাত্য জগৎ এই নূতন সৃষ্টির পথে মহোৎসাহে নিয়তই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—এই দুই আদর্শ কি কখনও মিলিতে পারে? এরূপ পরস্পর বিরোধী আদর্শদ্বয়ের মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? সেইজন্য অনেকেই বলেন আমাদের আদর্শ আমাদের থাকুক, ভারত চিরদিন নিবৃত্তির উপাসক থাকুক, পাশ্চাত্য জগতের ঐ তীব্র উন্মাদনা আমাদের পক্ষে শুভদায়িনী নহে। কিন্তু ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুই আদর্শের মিলন না হইলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম কাহারও মঙ্গল নাই। আর বস্তুতঃ মিলনের সাধারণ ভূমিও আছে। এ মিলন বুঝিতে হইলে আমরা আর একদিক হইতে আদর্শকে বুঝিতে চেষ্টা করি।

ভারত বহুকে ছাড়িয়া এককে চাহিয়াছে। বহুই মায়া—এই বহুকে অতিক্রম কর, ইহাই যোগের পথ। এই অবিদ্যা, এই প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই নিত্য একে লয় প্রাপ্ত হও।

ইউরোপের আদর্শ—এই বহুকে পরিত্যাগ করা নহে; কিন্তু ইহাকে সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া—ইহাকে আয়ত্ত করা। ইউরোপ এই বহুকে, এই প্রকৃতিকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। প্রকৃতি হইতে কত রস সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের ভাবনা ও সাধনার বিষয়। এইজন্য তাঁহারা সদা সচেষ্ট। এই দুই আদর্শ কি মিলিবে? ভারত বলিতেছে, প্রবৃত্তি দমন কর। ইউরোপ বলিতেছে—জীবনকে কখনই সঙ্কীর্ণ করিও না—এখানে মিলন কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু প্রশ্ন এই—বহুকে ছাড়িয়া একের অন্বেষণ কি যথার্থই মঙ্গলপ্রদ? এরূপে কি "এক"কে লাভ করা যায়! আবার পক্ষান্তরে—এককে ছাড়িয়া বহুকে অন্বেষণ করা কি প্রকৃত কল্যাণপ্রসূ? এই পথে কি বহুকে লাভ করিতে পারিবে? না, এক এবং বহুকে লইয়া যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে বোঝা—তাঁহাকে লাভ করাই মানবজীবনের পূর্ণ আদর্শ? ভারতের লোক তুমি, তুমি একজন বন্ধুকে চাও। তুমি আত্মার

ভিখারী—তুমি বন্ধুর অন্তরকে চাও। পুরস্কার-দান-অর্থ-বিত্ত তুমি কিছুই চাহ না। পশ্চিমে বলে—তোমার এ প্রয়াস কল্পনা মাত্র—সম্পূর্ণ বিফল। কোথায় আত্মা? আত্মার প্রকাশ ছাড়িয়া আত্মাকে কি বুঝিবে? আমি বন্ধুর সুমিষ্ট ব্যবহার চাই। এই দুইই কি ভ্রান্তি নহে? তুমি যদি আত্মা চাও, তবে তুমি বন্ধুর ওঠা, বসা, চলন, ফেরণ, কথা বলিবার ভঙ্গী—তাঁহার যত প্রকার আত্ম-প্রকাশ আছে সব তুমি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কর—তবে তো আত্মাকে জানিবে। বন্ধুর বাহিরের যে জীবন তাহাকে কাটিয়া ফেলিলে অন্তর্দৃষ্টি কমিয়া আসিবে, ভিতরের জিনিস ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে আসিতে শেষে শূন্যে পরিণত হইবে। আবার যে কেবল বাহিরের জিনিষ চাহিল সে ত নিতান্তই মূর্খ। প্রাণহীন দেহের সার্থকতা কোথায়? কিন্তু সেই ব্যক্তিই কি যথার্থ জ্ঞানী নহে যে আত্মাতেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, কিন্তু যে সেই আত্মাকে বাহিরের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়া লইয়াছে?

আমাদের দেশে যোগীর আদর্শের একটী ক্রম দেখা যায়। পূর্ব্বে যোগীর আদর্শ ছিলেন শিব। জটাজুট মধ্যে কল্যাণদায়িনী গঙ্গা—ইনি শ্মশানচারী, নীলকণ্ঠ। পূর্ণ হৃদয় লইয়া ইনি সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী কেবল নিজের জন্য। কিন্তু জগতের সেবায় তিনি পূর্ণপ্রাণ। অন্যে যাহা চাহে না, অন্যে যাহাকে ঘৃণা করে, তিনি তাহাকেই নিজের উদার বক্ষে গ্রহণ করেন। শ্মশান তাঁহার আলয়, হাড়মালা তাঁহার কণ্ঠের ভূষণ, জগতের ভীতিকর ঘৃণ্য হলাহল নিজে পান করিয়া তিনি নীলকণ্ঠ। এ মহান্ যোগীর আদর্শ। ভারতে চিরদিন এ আদর্শ থাকিলে দেশের অমঙ্গল হইত না। তার পর যোগীর আদর্শ—শঙ্করাচার্য্য। তিনিও বদরিকাশ্রমে পুঁথি লিখিতেছেন—তাহার পর দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছেন—মঙ্গল আদর্শ সকলকে দান করিবেন।

ইনি মহাদেবের মত না হউন—কিন্তু ইনি ত নিশ্চেষ্ট নহেন, ইনিও জগতের সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু তাহার পর যে যোগীর আদর্শ হইল সে আদর্শ ক্ষুদ্র, শুষ্ক, কঠোর। তাহা পূর্ণ নহে, শূন্য। বহুকে ছাড়িয়া একেকে লাভ করিবার বিকৃত চেষ্টার পরিণাম—এই শুষ্ক যোগীর আদর্শ।

এখন পশ্চিমের কথা ভাবুন। মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে কি উপায়ে? একবার ঐ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিকে চাহিয়া দেখুন। কি মহান্, কি বিশাল, কি গভীর। এখানে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের ইচ্ছাকে অন্বেষণ করিবার কি প্রাণপণ ব্যাকুলতা! এ অন্বেষণকে বন্ধ করিবে কেন? সত্যই তো অভাববোধ উন্নতি আনায়ন করে—তবে অভাবকে রোধ করিয়া উন্নতিকে রুদ্ধ করিবে কেন? ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে, প্রকৃতির সঙ্গে আপনার নিগূঢ় সম্বন্ধ খুঁজিতেছে, গ্রহ নক্ষত্রের সহিত আপনার যোগসূত্র অন্বেষণ করিতেছে—এ অন্বেষণের তো তাহার পূর্ণ অধিকার আছে। সে ভিতরে চৈতন্য লাভ করিয়াছে, বাহিরেও সে চৈতন্যের লীলা দেখিতে প্রয়াসী। এ অন্তর্বাহ্য সম্বন্ধকে এক করিয়া সে অভিনব মঙ্গল সম্বন্ধ অন্বেষণ করিবে না? তার পর, বাহিরের সম্বন্ধকে তুমি ক্ষণিক বলিবে কেন? তোমার জীবন দুদিনে ফুরাইবে বলিয়াই কি তুমি এইরূপ ভাবিবে? Europeএর বৈজ্ঞানিককে ভাব কি তাঁহার কঠোর তপস্যা! কি তাঁহার সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা! সত্যের বেদিকাতলে তিনি আপনার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছেন। জগতকে উন্নতির সোপানে তিল মাত্রও অগ্রসর করিয়া দিতে তিনি হাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। এই অভাব বোধ পাপ নহে—ইহা কখনই Mammon Worship নহে। তবে এক কথা, বিজ্ঞান শুধু "সত্য" দেখে, তাই সে অনেক সময় "একের" কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু এই সত্য ব্যতীত বিশ্ব রহস্যের আরও দুইটী

দিক আছে—"শিব", "সুন্দর"। কেবল এক দিক দেখিলে, একদেশ-দর্শিতা দোষ অবশ্যম্ভাবী। বিশ্ব যেমন সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তেমনি এই বিশ্ব নিয়ত মঙ্গলের পথে চলিয়াছে এবং এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই সুন্দর। যদি একত্রে এই "সত্য", "শিব", "সুন্দর"কে দেখিতে পার, তবেই আদর্শের মিলন সম্ভবপর। তখন ইহাদের মধ্যে আর বিরোধ লক্ষিত হইবে না।

ভারতে "বিদ্যা"র পথই সমধিক অনুসৃত হইয়াছে—তাঁহাকে জান। অবশ্য শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন তাঁহাকে জান এবং ভালবাস। কিন্তু তাঁহাকে জানার জন্যই যেন ভারতের প্রাণপণ আকিঞ্চন। পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা কি? St. Paul বলিয়াছেন—"We are fellow workers with God"—এই যে মহোচ্চ আদর্শ ইহা ভারতে নাই। Paul বলিয়াছেন—আমরাও ভগবানের ন্যায় সৃজনকারী। মানুষের কি উচ্চ অধিকারের কথা তিনি শুনাইলেন! ইউরোপ এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপ শুধু যন্ত্র গড়ে নাই, কিন্তু সে সমাজ গড়িয়াছে আপন স্বাধীন ইচ্ছায়, সে জাতি গড়িয়াছে, আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলিদান দিয়া।

উন্নতির দুইটী লক্ষণ আছে—Individual development—ব্যক্তিগত বিকাশ; Social development—সামাজিক বিকাশ। ব্যক্তিগত বিকাশ ভারতে হইয়াছে—কিন্তু সমাজের বিকাশ ভারতে হয় নাই—ইহা আমাদিগকে ইউরোপের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। জীবন্ত সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; সেই সমাজে প্রত্যেক মানবের পূর্ণ জীবন্ত অধিকার, যেখানে তাহার অবাধে স্বাধীন গতি। প্রত্যেকে আপনার জীবনের রক্তবিন্দু দান করিয়া সমাজকে পূর্ণতররূপে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। ভারত পরমাত্মাকে শিব সুন্দররূপে ভাবিয়াছে, কিন্তু শুধু তাঁহাকে শিব সুন্দর ভাবিলে

হইবে না। আরও গভীরভাবে দেখিতে হইবে। ভগবান নিজে মঙ্গল, আর তিনি চান যে মানুষ মঙ্গল সাধন করিবে। মঙ্গলের উপাসক কখনও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না—সুন্দরের উপাসক অসুন্দরকে দূর না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না—'We are fellow workers with God''—বহুকে উড়াইয়া এককে লাভ করা যায় না, এককে ছাড়িয়া বহুর উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু এক ও বহুকে লইয়া যিনি পূর্ণ, সেই পূর্ণ স্বরূপ "সত্য শিব সুন্দর"ই মানবের পূর্ণ আদর্শ। এই পূর্ণ আদর্শই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আদর্শের সাধারণ মিলন ভূমি।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।*

পাশ্চাত্য-আদর্শের অভিব্যক্তি।

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—পাশ্চাত্য আদর্শের ক্রমবিকাশ। ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হয়, যে জিনিষের ক্রমবিকাশ বলা যায় তাহা প্রথম হইতেই পূর্ণ প্রকৃতি লইয়া বর্ত্তমান থাকে। সেই প্রকৃতি প্রথমে সম্ভাবনা রূপে অন্তর্নিহিত থাকে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহাই পূর্ণ হইতে পূর্ণতর আকার লাভ করে। ভাবী তরুজীবনের সমস্ত ইতি-হাসটুকুই বীজের মধ্যে সম্ভাবনা-রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে। তাহার পর অল্পে অল্পে কত পরিবর্ত্তন হয়—অঙ্কুর, কাণ্ড প্রকাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল—এই সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভিতরকার সেই প্রকৃতিই পূর্ণতা লাভ করে। মনুষ্য জীবন সম্বন্ধেও এইরূপ। আমার ভিতরে

*ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৯১০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে বিবৃত।

আমিত্ব প্রকৃতি আছে, বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমি সেই আমাকেই পূর্ণতররূপে লাভ করি। "আমি" না হইয়া অন্য কিছু হইলে ইহাকে অভিব্যক্তি বলা চলিত না। অভিব্যক্তিতে জিনিষের "স্বরূপ"ই (Identity) পূর্ণতরভাবে বিকশিত হইয়া উঠে।

পাশ্চাত্য আদর্শ কি? ইহার উত্তর—পাশ্চাত্য আদর্শ ঈশা-চরিত। আর পাশ্চাত্য আদর্শের ক্রমবিকাশ—পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসের ভিতর ঐ ইশাচরিত্রের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। ঈশা পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্য দিয়া আপনাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর-রূপে প্রকাশিত করিতেছেন। "পাশ্চাত্য আদর্শের অভিব্যক্তি" বলিতে ইহা ছাড়া আমি অন্য কিছুই বুঝি না।

এখন হইতে দেখিতে হইবে—এই ঈশা-চরিত্র কি? এই জীবনের শিক্ষা যাহা, তাহা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। নিয়মের ধর্ম্ম (Religion of Law) হইতে প্রেমের ধর্ম্মে (Religion of Love) উন্নতি। পূর্ব্বে যেখানে ছিল বাহিরের শাসন, নিয়ম, সেখানে আসিল হৃদয়ের প্রীতি, ভালবাসা। ভিতরের এই ভালবাসাই মানুষকে দৃষ্টি দিবে, তাহাকে চক্ষু দিবে। ইহুদিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ছিল—বিধিপালন, বলিদান। ঈশা-চরিত্র দেখাইল, তাহা ধর্ম্ম নহে, ভালবাসাই ধর্ম্ম। হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম, আন্তরিক ভাল-বাসা ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা।

২। ভালবাসাই পূজা, কিন্তু এ ভালবাসা দান করিবে কাহাকে? কাহাকে ভালবাসিবে? পিতা বলিয়া ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু এখানে ঈশার এই শিক্ষার প্রকৃত-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ঈশা ঈশ্বরকে "অবতার" করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন "পিতা"! ভগবান্—Spirit,—নিরাকার; কিন্তু ইচ্ছাযোগে পিতা বলিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতিদান সম্ভবপর।

ভারতের নিরাকার যিনি, তিনি নির্গুণ ; সগুণ দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি অবতার। লোকে ঈশাকে অবতারে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু ঈশা কখনও ঈশ্বরকে অবতার করেন নাই। ভগবানকে যে ভালবাসা অর্পণ করিতে হইবে সে ভালবাসা ভাবের ও ইচ্ছার ভিতর দিয়া প্রকাশিত "Thy Will be done"। আমাদের দেশে 'পরাজ্ঞানের' ভিতর দিয়া মুক্তি, তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানা ইহাই এখানে মুক্তির উপায়। আবার ভক্তির অর্থ এখানে ভাবের উচ্ছ্বাস ; প্রমত্ততাতেই চরম সিদ্ধি। ঈশার ধর্ম্ম—উচ্ছ্বাস নয়, কেবল তাঁহাকে জানা নয়, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসা, এবং যাঁহাকে ভালবাসি প্রাণপণে তাঁহার ইচ্ছাপালন।

৩। আর একটী কথা। মানব-প্রকৃতি ও বাহিরের প্রকৃতিতে একটী শক্তি আছে, সে শক্তি মানুষের মনের মধ্যে আছে, তাহার নাম Satan (সয়তান)। ভগবানের সহিত ইচ্ছাযোগের পথে এই শক্তি বাধা প্রদান করে। ইহাকেই "Powers of Darkness", "Principalities" প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ঈশার শিক্ষায় সয়তান আছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। সয়তান তাঁহাকে কত প্রলোভন দেখাইল—"এস আমার সঙ্গে তোমাকে রাজ্য দিব, আহা! কেন এ ভাবে কষ্ট পাও!" তিনি দীপ্ততেজে সয়তানকে বলিলেন—"Get thee behind me, Satan"—দূর হ' সয়তান। এই সয়তান-শক্তি আছে। কিন্তু ইহা হিন্দুদিগের "অবিদ্যা" বা "মায়া" নহে। অবিদ্যা—মায়া, ইহারা সৃষ্টি করে, ইহারা আবরণ রচনা করিয়া সার সত্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে—সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে ইহারা। এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া চিন্ময়ে প্রত্যাবর্ত্তনই মোক্ষ। Satan কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করে নাই ; সৃষ্টি করিয়াছেন ভগবান—Logosএর ভিতর দিয়া, শয়তানের ভিতর দিয়া নহে। শয়তান মানুষকে ভগ-

বানের সহিত যুক্ত হইবার পথে বাধা দেয়, মানুষকে পাপের পথে লইয়া যায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন শক্তি আছে যে শক্তির বলে মানুষ এই সয়তানের মস্তকের উপরে নিজের পা রাখিয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারে।

৪। ভগবান হইতে এই বিচ্যুতিই পাপ। এই পাপ হইতে পরিত্রাণ-লাভের পন্থা কি? ইহার একমাত্র পন্থা—অনুতাপ। পাপ অনুভব কর, পাপকে গোপন করিও না, পাপকে ছোট করিও না, চাপা দিও না। তার পর অনুতাপ কর, তোমার জন্য ক্ষমা আছে। এই ক্ষমা তোমাকে আবার পুণ্যের পথে লইয়া যাইবে। অনুতাপে ক্ষমা লাভ করা যায়।

৫। পাপ থাকিলে নরকও থাকিবে, ঈশার শিক্ষায় নরকও আছে। কিন্তু তাহার উপর আছে—"Kingdom of Heaven"—স্বর্গরাজ্য। ঈশা বলিলেন—Repent, কেন? কারণ, স্বর্গরাজ্য নিকটে। এ নিরাশার রাজ্য নহে, এখানে আশা আছে। অনুতাপ করিলে Atonement লাভ হয়, ভগবানের সহিত মিলন হয়। কিন্তু এ মিলন Direct ব্যক্তিগত মিলন নহে ; এ মোহকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাওয়া নহে ; কিন্তু এ মিলন ব্রহ্মের সহিত যোগ, ইচ্ছাযোগে পিতার সহিত সম্মিলিত হওয়া। এ যোগ হয় সন্তানের ভিতর দিয়া, বিশ্ব-মানবের মধ্য দিয়া। একটী ভাইকেও ছাড়িয়া এ মিলন সম্ভবপর নহে, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া সেই একত্র সম্মিলিত অখণ্ড মানব-পরিবার লইয়া এ মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। Vine যেমন লতা-পাতা, ফুল পল্লব লইয়া একটী শরীর, তেমনি পুত্রত্বের (Sonship) ভিতর দিয়া মানব-মণ্ডলী—এক অখণ্ড পরিবার। চরিত্রে চরিত্রে মিলন ; একটী শরীর, একটী অঙ্গ, একটী "মহা-মানব"—এই মানব-ব্রহ্মের সঙ্গে এক—ইহাই Atonement।

এই দল হইতে যদি একটী "মেষ"ও বিচ্যুত হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে সেই "Lost sheep"কে অন্বেষণ করিয়া আনিতে হইবে, কারণ একটীকে ছাড়িলে এই "Kingdom of Heaven" লাভ করিবার অধিকার থাকিবে না।

এই খৃষ্ট-আদর্শ এসিয়া হইতে যাইয়া বীজ-আদর্শ রূপে ইউরোপের জাতীয় জীবনে পতিত হইয়াছিল। তাহার পর এই মূল আদর্শই পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া পাশ্চাত্ত্য জীবন ও সভ্যতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখনও ইহা পূর্ণতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু একথা সত্য যে এই আদর্শই পাশ্চাত্যজীবনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং দিন দিন বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথার আলোচনা আবশ্যক। সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিকাশ, ইহা একটী New Ideal, নূতন অনুভূতি। সামাজিক ক্রম-বিকাশের ভাব এই ধারণাকে দিন দিনে পরিষ্কার করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু যদি সমাজে সমাজে তুলনা করিয়া দেখিতে হয়—যদি দুইটী সমাজের মধ্যে আক্ষেপিক উন্নতি ও অবনতির কথা আলোচনা করিতে হয়, তবে সে বিষয়ে আমাদের মান দণ্ড (Tests) কি? সে Tests প্রধানতঃ দুইটী :—

(ক) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; অন্য কথায়, ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ—শুধু কয়েক জনের মাত্র নহে, কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির। ব্যক্তিগত জীবন পূর্ণ-বিকাশ বিষয়ে কি পরিমাণ সাহায্য লাভ করিয়াছে। Hegel বলেন, এই স্বাধীনতার ইতিহাসে ক্রম-পর্য্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে।

১। Orientalsদের মধ্যে একজন মাত্র স্বাধীন—একজন মাত্র স্বাধীন সম্রাট, অবশিষ্ট সকল ব্যক্তিই Slaves—দাস। হয়তো তিনি ব্রাহ্মণ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই মতকে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইব না।

২। তাহার পর গ্রীকজাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকের (a few) স্বাধীনতা আছে, অধিকাংশের কোন স্বাধীনতা নাই।

৩। তাহার পর দেখা যায় যে (many) অধিকাংশের আছে—অল্পসংখ্যকের নাই।

৪। তাহার পর—প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীনতা আছে, কোন বাধা, অন্তরায় নাই। শাস্ত্র বা রাজা বা সমাজ এ পথে কোন বাধা দান করেন না, সকলেই পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী।

এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মানদণ্ডে সামাজিক উন্নতি বা অবনতি তুলিত হইতে পারে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ—সামাজিক আকার। সমাজের কি আকার? কে অধিক, কে অল্প অগ্রসর? সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির সম্বন্ধ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যষ্টির বিকাশ না হইলে সমষ্টির বিকাশ অসম্ভব, সমাজান্তর্গত প্রত্যেক বক্তির উন্নতি না হইলে সমগ্র সমাজের উন্নতি হইতে পারে না, কিন্তু ইহাও অতি সত্য কথা যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নির্ভর করে এই সমাজিক উন্নতি বা অবনতির উপরে। সমগ্র সমাজ অনুকুল হইলেই আদর্শ উজ্জলভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

ঈশার বীজ যখন ইউরোপীয় সমাজভূমিতে গিয়া পতিত হইল, তাহার পূর্ব্বে সেখানে আদর্শের বিকাশ কিছু হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা দুইটী জিনিস দেখিতে পাই।

১। জাতীয় জীবনে ধর্ম্মভাব।

Socrates, Aristotle, Plato প্রভৃতির ভিতর দিয়া আসিয়া Stoicsদের মধ্যে অভিব্যক্ত। Socratesএর প্রধান শিক্ষা—"Know thyself" নিজের ভাবকে কি পরিমাণে নিজস্ব করিতে পারিয়াছ তাহা ভাবিয়া দেখ। কিন্তু তাঁহার উচ্চতম শিক্ষা—তাঁহার নিজের

জীবন। যীশু হৃদয়ের বিশ্বাস রক্ষা করিতে গিয়া ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যীশুর বহুপূর্ব্বে এই নির্ভীক দার্শনিক বিশ্বাসের বেদিকাতলে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জীবনদান হইতেই ইউরোপের মূলমন্ত্র। তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তোমার জীবনের রক্ত দিয়া। ইহাই আদর্শের দৃঢ়তম প্রতিষ্ঠা। আর ইহার বিপরীত ভাব এই—আদর্শ অন্তরের বস্তু; বাহিরে যদি সে আদর্শকে realise বা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি তাহাতে ক্ষতি কি? অন্তরের বিশ্বাস অন্তরে স্থির রাখিতে পারিলেই হইল। কিন্তু ইউরোপের এ শিক্ষা নয়। "বাহির" মায়া নহে, বাহিরও সত্য। আদর্শকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে, তাহার জন্য দান বেশী কিছুই নহে। সক্রেটিসের বিচার প্রসঙ্গে Groteও যেন Democracyর কতকটা সমর্থন করিয়াছেন—Socrates কি একটু নরম হইতে পারিতেন না? কিন্তু Socrates বিচারকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি বলিলেন? "আমি দয়ার ভিখারী হইয়া এখানে আসি নাই; আপনারা যদি আমাকে দয়া করেন তবে সে দয়া আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি। আমি চাই justice, ন্যায় বিচার।" তিনি নিরপরাধ—হৃদয় তাঁর অকলঙ্ক, তাই তাঁহার প্রাণে এই সিংহবিক্রম, এই "Strength of Ten"! আমি শাস্তির উপযুক্ত নহি—আমি সম্মানের পাত্র; আমাকে সম্মান দেওয়া হউক। তিনি বাহিরের কাছে মস্তক নত করিবেন কেন? তিনি প্রাণদানে প্রাণের প্রিয়-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন।

তাহার পর Stoics সম্প্রদায়। তাঁহারা একাধারে Pantheists এবং Theists—ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের শরীর এবং আত্মা। মানুষের নিজের ইচ্ছার বাহিরে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে তাঁহারা পূর্ণ-উদাসীন। তাহাকে তাঁহারা "ভাল"ও বলিবেন না, "মন্দ"ও বলিবেন না।

এইরূপে তাঁহারা মানব প্রকৃতিকে উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আত্মসম্মান জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন— তাঁহারা মানব-প্রকৃতির উচ্চতা ও গাম্ভীর্য্যকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে natural slavesএর ধারণা সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন জগতে কেহই স্বাভাবিক দাস নহে। মানুষের অধিকারকে খণ্ডিত করিবার অধিকার মানুষের নাই, সকলে মিলিয়া এক। Stoicsদিগের এই ভাব।

২। রোমীয় সাম্রাজ্য।

এ সাম্রাজ্য পারসিক বা সিকন্দরের (Alexander) সাম্রাজ্য হইতে বিভিন্ন। ইহার মূল ভিত্তি কি? জীবনকে এক করা—এই ইহার মূল লক্ষ্য। দিগ্বিজয়ে ইহার আরম্ভ বটে, কিন্তু ইহার নিগূঢ় সাধনা—একটী Civilisation জগতে প্রতিষ্ঠিত করা। রোমীয় নাগরিকের অধিকার, লাটিন ভাষা, রোমের গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী—এক কথায় রোমীয় সভ্যতার উচ্চ অধিকার সকলকেই দান করিতে হইবে, জগতকে Romanise করিয়া লইতে হইবে। রোমের অভ্যুদয়কালে রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই এখনও ইউরোপ একটা দেশ। France, Germany প্রভৃতি প্রাদেশিক বিভাগ সত্ত্বেও সমগ্র ইউরোপ এক ভাবে অনুপ্রাণিত। ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ কখনই এক দেশ নহে—এ কথা ঠিক নহে। সম্রাট অশোকের সময় হিন্দু বৌদ্ধ মিলিত হইয়া এক ছত্রের তলে আসিয়াছিল। যখন এরূপ ভাবে এক ছত্রের তলেও নহে তখনও ভারতের Spirit এক। রামায়ণ মহাভারতে ইহার বহুল নিদর্শন আছে। তবে politically ভারত চিরদিন separate বা বিচ্ছিন্ন থাকিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর Civilisation এক হওয়া বিষয়ে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই।

ইউরোপে এই একত্বের আরম্ভ Roman civilisationএ। ইহারই মধ্যে ঈশার বীজ আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইহার প্রথম ফল হইল এই—ইউরোপে Churchএর Unity বা একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজারা প্রথম দীক্ষিত হইলেন, তাহার পর প্রজাবর্গ। কিন্তু এই রাজা প্রজা সকলকে অতিক্রম করিয়া লোক-সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল—Christian Church, রোম হইল ইহার কেন্দ্র, Pope হইলেন ইহার কর্ত্তা। Empires বিভিন্ন থাকিল, কিন্তু সকল রাজ্যের উপর স্থাপিত হইল—Kingdom of Heaven. তাহার পর Church ও Stateএর মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। Temporal *vs.* Spiritual—কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত। Church চাহিয়াছিলেন Stateকে নিজের অধিকারভুক্ত করিতে এবং ধীরে ধীরে Stateকে নিজের মধ্যে টানিয়া লইতে লাগিলেন। এখানেও মূলমন্ত্র ঠিক ঈশার মূলমন্ত্র। Barbariansরা দুর্দ্দান্ত; দিগ্বিজয়ের লালসায় তাহারা উন্মত্তপ্রায়, কিন্তু ইহারাই কেন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে? কি মোহমন্ত্রে আধ্যাত্মিক আদর্শের সম্মুখে ইহারা আপনাদের উদ্যত ফণাকে অবনত করে? ইহার মূলে—ঐ সয়তান, ঐ তীব্র পাপবোধ। যে শক্তি আমাদের ইচ্ছাকে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার পথে বাধা প্রদান করে, যাহা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় সেই পাপশক্তির বোধ কি গভীর! গভীর না হইলে Church কখনও জয়ী হইতে পারিতেন না। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় হেনরি অতুল প্রতাপান্বিত হইয়াও এই পাপবোধের তাড়নায় নিজের পৃষ্ঠদেশে চাবুক প্রহার করিতেছেন! আর একজন নৃপতির দৃষ্টান্ত দেখুন। Pope Gregory VII জানাইলেন কোন Temporal Powerএর Bishop নিয়োগ করিবার অধিকার নাই। রাজা Henry IV বলিলেন—আমি তোমাকে মানি না। পোপ হেনরিকে

depose করিলেন। ইহার ফল কি হইল? প্রবল প্রতাপ নরপতি দীনহীনের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। পোপ তাঁহার সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। আজন্ম সুখলালিত সম্রাট নিরাশ্রয় অবস্থায় অনাবৃত দেহে পাদুকাশূন্য পদে দারুণ শীতের মধ্যে ৩ দিন ৩ রাত্রি Popeএর ভবনের সম্মুখে পড়িয়া থাকিলেন। তখন Pope তাঁহাকে Pardon দিলেন। এই তীক্ষ্ণ পাপ বোধই এই বশ্যতা স্বীকারের মূল। খৃষ্টধর্ম্ম পাপবোধকে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল, নরকজ্ঞানকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা উদ্ধারেরও উপায় প্রদর্শন করিয়াছিল—সে উপায় ভগবানের ক্ষমা। এ ক্ষমা আসে ঈশার ভিতর দিয়া, তাহা আবার আসে Churchএর ভিতর দিয়া। নরক হইতে বাঁচিতে হইবে—ইহাই মূল ভাব।

ইহার সঙ্গে মিলিয়াছিল monasticismএর আদর্শ। খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও আমাদের দেশের সন্ন্যাসীর মধ্যে পার্থক্য আছে।

উভয়ের মধ্যে মিল এই যে উভয়েই পৃথিবীর Vanities—সংসারের অর্থ, সম্পদ, গৌরব, বিলাসকে বিসর্জ্জন দিতে চান, সুখকে সুখ বলিয়া পরিহার করিতে চান। কিন্তু পার্থক্য এই যে খৃষ্টান সন্ন্যাসী হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় মায়াতীত পরব্রহ্মে বিলীন হইতে চাহেন না—তিনি চাহেন সয়তানের রাজ্যকে পরিত্যাগ করিয়া Kingdom of Heaven-এর অধিবাসী হইতে। মায়া বলিলে বিশ্ব সংসার শূন্য হইয়া যায়! Christian temporal world শূন্য নহে, কিন্তু সয়তানের রাজ্য। আর Spiritual world যেখানে Christ, যেখানে Vine—সেই রাজ্যের অধিবাসী হইতে হইবে।

আর একটী বিশেষ ভাব যাহা সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইল—তাহা Heaven, Hell, ও Purgatoryর ভাব। মহাকবি Dante, যাঁহার

মধ্যে প্রকৃতই "Ten Silent Centuries found a voice", তিনি এই ভাবকে ছবির মত করিয়া আপনার কাব্যে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। Hell (নরক) আছে উহা কল্পনা নহে। তাঁহার বর্ণনার বিশেষত্ব এই—তাহাতে জীবন্ত ভাবে এই মহান সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে "Sin is its own punishment"—পাপের দণ্ড পাপ নিজেই। পাপের নিজের মূর্ত্তি কি তাহাই তিনি নিপুণ তুলিকায় তাঁহার অমর কাব্যে চিত্রিত করিয়াছেন। নরকের দ্বারদেশে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—"Abandon all hope, ye that enter here"—যাহারা এখানে প্রবেশ করিবে তাহারা সকল আশা পরিত্যাগ কর। বস্তুতঃ যেখানে কোন আশা নাই—সেই তো নরক। সেই নরকে কি ভীষণ হৃদয়-বিদারী দৃশ্য—সেখানকার অধিবাসিগণ পরস্পর পরস্পরের মাথা কামড়াইতেছে; সেখানে বৃক্ষেরা কথা কয়—ভিতরে কি এক মহান মর্ম্মচ্ছেদী দুঃখের ভার! অশ্রুপাত করিয়া হৃদয়ের দুঃখ ভার লঘু করিবে সে অধিকার টুকু পর্য্যন্ত সেখানে নাই—সেখানে অশ্রু রক্ত হইয়া বহির্গত হয়! পাপের প্রতিকৃতির কি জীবন্ত ছবি! পাপ এ জীবনের কঠোর সত্য—সয়তান কল্পনা নয়। ইচ্ছা জিনিষ যথার্থই আছে—সে মৃত্যু দিয়া আপনাকে realise (পূর্ণ) করিতে চায়। যে তাহাকে এই পথে বাধা দেয়—সেই সয়তান। এ সয়তান মায়া বা শূন্য নহে, পুণ্য পথের পথিক মাত্রেই এই সয়তানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন।

তাহার পর Purgatoryর পাহাড়। এই Purgatory অনুতাপের যাথার্থ্য ও সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই পথের যাত্রী সম্প্রদায় বহু কষ্টে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। পথে অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন—শত বিভীষিকা; কিন্তু আশা মরে নাই—প্রাণে এ বিশ্বাস আছে, পথে যত বর্ষই অতীত হউক না—যত বাধা যত বিঘ্ন

গতিকে শৃঙ্খলিত করুক না—একদিন সব শত্রু পরাজিত হইবে, সকল বাধা চূর্ণ হইবে, সাফল্যে সকল দুঃখের অবসান হইবে। ঐ উর্দ্ধে স্বর্গরাজ্যের আনন্দ নিকেতন—সে ভবনে এক দিন প্রবেশ লাভ ঘটিবেই ঘটিবে। নরকের দ্বারের সংবাদ যেমন "নিরাশা", Purgatoryর সুসংবাদ আশা। হৃদয়ে অমর দীপ জ্বালিয়া, প্রাণে অনন্ত আশা লইয়া চলিলে Purgatoryতে যাওয়া যায়, এবং স্বর্গের আনন্দলোকে সুপ্রভাত দর্শন ঘটিয়া থাকে।

এই Hell, Purgatory ও Heaven লইয়া ইউরোপের আদর্শ। এই আদর্শকে অধিগত করিবার জন্য ইউরোপ চেষ্টা করিতেছে। এই আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে Roman Catholic Church, সে জন্য এ Church জগতের ধন্যবাদার্হ।

তাহার পর আদর্শ আসিল এই—একজন Pope কেন সকলের উপর আপনার অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিবে? ইহা আধিপত্যের অপব্যবহার। তখন Luther এর অভ্যুদয় হইল—Protestantism জগতে এই মন্ত্র প্রচারিত করিলেন—এক স্থানের Popeএর এ অধিকার নাই যে তিনি Churchএর নামে সকলকে শাসন করিবেন। সুতরাং তখন আদর্শ দাঁড়াইল এই—ভগবানের সহিত প্রত্যেকের অব্যবহিত সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধের আলোকে প্রত্যেক মানব আপনার জীবনকে পরিচালিত করিবেন। ইহাতে দৃশ্যত Churchএর unity (একত্ব) চূর্ণ হইয়া গেল। Protestantism শতধা বিভিন্ন হইয়া কত সম্প্রদায় গঠন করিয়া তুলিল। কিন্তু ইহাই তো তাহার গৌরব। Protestant Churchএ unity—একত্ব নাই তাহা নহে. এখানে বাহিরের unity নাই। কিন্তু যাহা একত্ব অপেক্ষা উচ্চতর unity তাহা এখানে আছে—সে unity, স্বাধীনতার unity। অবশ্য যেখানে এ unity নাই সেখানে প্রকৃত Protestantismএর spirit নাই।

এখানে বাহির দেখিতে যেন শুধুই differentiation, কিন্তু এই differentiation (বিশ্লেষণ)ই তো integration বা সংশ্লেষণকে দৃঢ় করিয়া দেয়। যখন আমি দেখি যে আমার যাহা প্রিয় আদর্শ তাহাই অপরে স্বাধীন ভাবে আপনার আদর্শরূপে জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছে—তখনই গাঢ়তর মিলন সম্ভবপর হয়। বাহিরের শাসন হইতে যে মিলন আসে তাহাতে এরূপ দৃঢ়তা কখনই থাকিতে পারে না। Protestantismএর মধ্যে বিশ্লেষণ আছে কিন্তু তাহার মধ্যেই সে Churchকে অনুপ্রাণিত করিয়া একটী জীবন বর্ত্তমান। চিন্তা-স্রোত, ভাবের প্রবাহ একই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যে সকল ক্রম পরম্পরা অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য জীবন বর্ত্তমান পর্য্যায়ে (stage)এ আসিয়া উপনীত হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ—

(1) Theological Military :

ইহা অতিপ্রাকৃত বাদের পর্য্যায়। এ যুগে মানুষের বিশ্বাস ভগবান miraclesএর ভিতর দিয়া তাহার ইচ্ছা ও প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। সেই জন্য এ যুগে যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, কাণ্ডের ব্যবস্থা। এ ভাব অল্পাধিক পরিমাণে এখনও সকল ধর্ম্মেই রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম miracle, প্রার্থনা miracle, ইহারই সঙ্গে জাতিতে জাতিতে বিবাদ যুদ্ধ। আপন আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে জাতি সকল ব্যস্ত। সেই জন্য crusades ইত্যাদি।

(2) Rational-Constitutional :

ইহা বিচার ও সমালোচনার যুগ। এ যুগে মানুষ সমাজের গঠন, তাহার বিধি ব্যবস্থা ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত। সমালোচনার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া মানুষ সমাজ সংস্কারে বদ্ধপরিকর। Parliamentএর সংস্কার Churchএর সংস্কার, নিয়ম বিধি প্রতিষ্ঠা—ইহাই

এ যুগের বিশেষ লক্ষণ, Church সমাজকে অধিকার দিয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে অন্তর্গত ভাবে আছে—Revolution—বিপ্লব, অন্তর্দ্রোহ ইত্যাদি।

(3) Ethical-Industrial :

ইহাকে বিজ্ঞানের যুগ বলা যাইতে পারে। মানুষের আর miraclesএ বিশ্বাস নাই। বিজ্ঞানের বিশেষ ভাব (spirit)—নিয়মে বিশ্বাস। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক যুগে Supernaturalএর আর কোনই অবকাশ নাই। Applied Scienceএর সাহায্যে মানুষ মানুষের অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প। জল হইতে বাষ্প, আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আনিয়া মানুষ জগতে কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত। এই Science এখন ধর্ম্মকে Ethical করিয়াছে। ইউরোপ এখন বিশিষ্ট ভাবে ethical হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছাকে প্রবল করিয়া তোলার (emphasise) ভাব যে ইউরোপে প্রথম হইতেই ছিল, বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই ভাবই দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করিতেই হইবে—Satanকে দূর করিতেই হইবে। এ যুগের Satan—one's own lower-self ; এখন সয়তান—মানুষের নিজেরই নিম্নতর প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিই দাঁড়ায় তাহার নিজেরই বিরুদ্ধে, তাহার উচ্চতর প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের বিরুদ্ধে। ইহাকে জয় করিতে হইবে—শুধু জ্ঞানে ও ভাবে নয় কিন্তু ইচ্ছা দ্বারা।

ইহারই সঙ্গে এ যুগ Industrial যুগ। পূর্ব্বে ভাব ছিল যে আত্মাই Divine ; সুতরাং আত্মার কল্যাণেই সকলে ব্যস্ত ছিলেন, শরীরের খোঁজ কেহই রাখেন নাই—অথবা শরীরকে অবহেলা করিয়া তাহার অভাবে কেহ মনোযোগ অর্পণ করেন নাই। এখনকার আদর্শ—শরীরও Divine, শারীরিক অভাবকে উপেক্ষা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে না। Physical needsকে পূর্ণ করিতে হইবে। সুতরাং

ধন লাভের সজাগ চেষ্টা চারিদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে উন্মত্ততা আছে স্বীকার করি, কিন্তু ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কি? সেই lost sheepকে খুঁজিয়া আনিবার প্রয়াস। সকলকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য; কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া গেলে স্বর্গরাজ্যের দ্বার কখনই খুলিবে না। সুতরাং দুঃখী ভাই ভগিনীকে হাতে ধরিয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতের সাধনা—দীন, দরিদ্র, অভুক্ত, অশিক্ষিত সংসারে থাকিবে না। সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইবে—কর্ম্ম বিনা জীবের মুক্তি নাই। কর্ম্মের দ্বারাই উচ্চতর বৃত্তি চরিতার্থ হইবে এবং জগত স্বর্গরাজ্যের দিকে উন্নীত হইবে। তবে এ কথাও সত্য যে অনেক স্থানে লক্ষ্য ভুল হইয়া গিয়াছে। মানুষ উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত কর্ম্মচাঞ্চল্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন—অর্থের লালসায় বিভ্রান্ত হইয়া, মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অর্থ সঞ্চয়েই মত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ক্রমশঃ আবার ভালর দিকে গতি পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ধনিদিগের মধ্যে আবার এ আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে—আমি আমার সর্ব্বস্ব জগতের মঙ্গলের জন্য দান করিয়া যাইব।

পূর্ব্বে Temporal ও Spiritualএর মধ্যে বিরোধ ছিল, Church ও Stateএর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এখনকার ভাব এই—Church এবং State আর ভিন্ন থাকিবে না, Stateই Church হইয়া যাইবে। সংসারই বিধাতার পবিত্র মন্দির হইবে। এখন আর Church স্বতন্ত্র থাকিয়া সংসারকে (State) শাসন করিবে তাহা নহে কিন্তু মানুষ হইবে a law unto himself, বাহিরের শাসনের আর কোন আবশ্যকতা থাকিবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদিও পাশ্চাত্য জগতে ইচ্ছার দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাবের দিকে এখনও অনেক অভাব রহিয়া গিয়াছে। সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এ অভাব প্রাণে অনুভব

করিতেছেন এবং সেই জন্যই এখন তাঁহারা ভাব সম্পদের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সেখানে এই ভাবের দিক প্রস্ফুটিত হইলে, পাশ্চাত্য আদর্শ আরো সরস এবং মধুর হইয়া উঠিবে।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

প্রাচ্য-আদর্শের অভিব্যক্তি। *

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ঃ—প্রাচ্য-আদর্শের অভিব্যক্তি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে "পূর্ব্ব জগতের" বলিতে আমি বুঝিয়াছি আমাদের দেশের, ভারতের, হিন্দুদিগের। ব্যাপক অর্থে পূর্ব্ব জগতের কথা বলিতে গেলে বৌদ্ধ, চীন, জাপান প্রভৃতিরও ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু সে সকল আলোচনা আমার বিষয়ের অন্তর্গত নহে। আমার বিষয়—হিন্দুসমাজ, ভারতের আদর্শ।

যখন পাশ্চাত্য আদর্শের কথা বলিয়াছিলাম, তখন Niagraর জলপ্রপাতের সহিত আমি তাহার তুলনা করিয়াছিলাম। সেই উজ্জ্বল জলরাশির অবিরাম শব্দ, সুমহান তেজ, চঞ্চল গতি—মনে হয় তাহা পাশ্চাত্য জীবনের তেজ, কর্ম্ম ও গতিরই নিদর্শন। আমি Niagraর উচ্ছ্বাসময়ী চঞ্চলা মূর্ত্তি দেখিয়াছি। কিন্তু আমি তাহার আবার একটী ভিন্ন মূর্ত্তিও দর্শন করিয়াছি—সে স্থির নিশ্চল মূর্ত্তি। সেই উদ্বেলিত জলরাশির প্রবাহমান ধারা কি শক্তিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে! জীবনের আবেগময় উচ্ছ্বাস যেন কাহার শীতল স্পর্শে সহসা জমাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেটী শীতকালের ছবি। যদি এই মূর্ত্তির ছবি আপনাদের সম্মুখে ধরিতে পারিতাম তাহা হইলে ভাল হইত—আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেন গ্রীষ্ম ও শীতের

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৯১০ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে বিবৃত।

মূর্ত্তির কত প্রভেদ। ইহা দেখিলে মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উত্থিত হয়—সেই প্রচণ্ড স্রোত গতি, তেজকে প্রতিহত করিয়া কোন্ শক্তি তাহাকে এরূপে জমাট রাখে? শীতে সত্য সত্যই Niagara জমিয়া যায়। জলের তরল স্ফুলিঙ্গরাশি তখন বরফের কঠিন আকারে পরিণত—যেন প্রকাণ্ড একটী বরফের বিটপী। তাহাতে পত্র নাই—তাহার শাখা বিশীর্ণ কিন্তু মস্তকোপরি কুসুমের আকারে তুষারের স্তবক। এত বড় প্রকাণ্ড স্রোত কোন্ শক্তিতে জমাট মূর্ত্তি ধারণ করিল।

আজ প্রাচ্য আদর্শের কথা বলিতে গিয়া Niagaraর সেই শীতকালের জমাট মূর্ত্তিটিই আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান দেখিতেছি। সে মূর্ত্তিতে প্রাণের অদম্য উচ্ছ্বাস নাই—সেখানে স্রোতের অবিরাম গতি নাই। তেজ, গতি, চাঞ্চল্য, উচ্ছ্বাস সহসা থামিয়া গিয়া এক নিশ্চল জমাট মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। সে আকার নিঃসন্দেহ সুন্দর আকার—তাহাতেও মন মুগ্ধ হয়, হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়—কিন্তু তাহাতে প্রাণের গতি নাই। আপনারা যদি মনকে স্থির করিয়া চিন্তা করেন যে আমাদের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম্ম, হিন্দুর আদর্শ, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর বস্তু কি—তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে আপনাদের চক্ষুর সম্মুখে একটী প্রবাহমান জলস্রোতের ছবি আসিবে না—কিন্তু আসিবে একটী স্থির শান্ত, বিরাট জমাট বাঁধা মূর্ত্তি—তাহাতে প্রাণ নাই, গতি নাই, শক্তি নাই, তেজ নাই, ঠিক সেই Niagaraর শীতের ছবি। ইহাই প্রাচ্য আদর্শের ছবি। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শ উভয়েই সেই আনন্দময়ের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শ Niagaraর গ্রীষ্মের মূর্ত্তি—Eyrie হইতে বাহির হইয়া St. Laurenceএ পড়িয়া শেষে অনন্ত সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে—সমস্তটাই গতির ইতিহাস। এ আদর্শ অবিশ্রান্ত-গতিতে আনন্দময়ের অন্বেষণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; ইহার গতিকে কেহই থামাইতে পারে না।

আমাদের হিন্দু সমাজও সেই উদ্দেশে বাহির হইয়াছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত পূর্ণোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে—মধ্য পথে কোন্ শক্তি সহসা তাহার স্রোতকে প্রতিহত করিয়া গতিকে থামাইয়া দিয়াছে। এই রুদ্ধ স্রোত জলরাশি জমাট মূর্ত্তিতে একটী সুন্দর আকার পরিগ্রহ করিয়াছে—সে মনোহর মুর্ত্তি, কিন্তু তাহাতে স্রোত নাই, তেজ নাই। আর ইহা প্রকৃতির একটী অখণ্ড নিয়ম যে যাহা থামিয়া যায় তাহাতে ধীরে ধীরে আবর্জ্জনারাশি আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, কেহই তাহা রোধ করিতে পারে না। নদী যদি ডোবায় পরিণত হয় তবে তাহাতে পঙ্কিলতা অনিবার্য্য। অবশ্য হিন্দু আদর্শ সম্বন্ধে ঠিক এরূপটী ঘটে নাই—সে নদী ডোবায় আবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু Niagara যেমন শীতে জমিয়া যায় তেমনি ইহাও জমিয়া গিয়াছে—এই জমাট মূর্ত্তিও অপূর্ব্ব সুন্দর শোভার মূর্ত্তি—কিন্তু সেখানে নিশ্চল স্থিরতা—সেখানে দুর্গম তেজ নাই—সেই জন্য তাঁহা রুদ্ধগতি—সেইজন্য সেখানে আবর্জ্জনা আসিয়া জমিয়াছে—সে আবর্জ্জনা রাশিকে ঠেলিয়া ফেলিবার শক্তি তাহার নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবর্জ্জনা তাহার বহির্ভাগকে মলিনতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই আবর্জ্জনা বিদূরিত হইলে আবার সুন্দর মূর্ত্তি বাহির হইতে পারে। আমাদের আদর্শ অধুনা এই মূর্ত্তিতে বিরাজমান।

কেহ কেহ বলিবেন—"হিন্দু সভ্যতার ক্রম বিকাশ"—এ কথাটাই সঙ্গত নহে। বিকাশ কোথায়? আমি একখানি পুস্তক পড়িতে-ছিলাম—তাহা চিন্তাশীলতায় পূর্ণ—সেখানি শ্রদ্ধেয় ভূদেব বাবুর "পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধ"। তিনি বলেন—পাশ্চাত্য Sociologists দিগের মতে সমাজ একটী জীবন্ত জিনিস। শরীরের যেমন ক্ষয় বৃদ্ধি, জরা মৃত্যু আছে, সমাজেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি নিজে সমাজকে এভাবে দর্শন করেন না। তাঁহার মতে সমাজ অজর

অমর, স্থির বস্তু, যেমন তাজমহল। তাজমহলের যে সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্য চিরদিনের মত তাহাতে স্থির হইয়া আছে। তাঁহার মতে সমাজ চিরন্তন কালের জন্য (once for all) গঠিত হইয়া যায়। একবার গঠিত হইয়া গেলে আর তাহার আকার পরিবর্ত্তন নাই। আপন প্রাচীন ভিত্তির উপর সে চিরদিনের জন্য স্থির হইয়া থাকে। সেই জন্য ভূদেব বাবু সমাজের বিকাশ বুঝেন না। মধ্যে মধ্যে কড়ি বরগা প্রভৃতি বদলান আবশ্যক হয়—সে সময়ে অতি সন্তর্পণে জীর্ণ কড়িকে সরাইতে হইবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব মূর্ত্তিকে অখণ্ড আকারে বজায় রাখিয়া সাবধানে একার্য্য সাধন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যরূপ সংস্কার ভ্রম মাত্র, অনিষ্টের হেতু। যেমন তাজমহলে নূতন প্রস্তর বসান হইয়াছে, কুতবমিনারের চূড়া বসান হইয়াছে, ইহা ঠিক তেমনি। আকার, প্রণালী, নিয়ম স্থির আছে; যদি কোথাও কোন ব্যতিক্রম মনে কর তবে মৌলিক ভাবকে সযত্নে রক্ষা করিয়া সংস্কার সাধন কর। অবশ্য তাঁহার লেখায় তিনি সর্ব্বত্র এই ভাবের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই—তাঁহাকেও সময়ের প্রভাব স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে ইহাকেই তিনি সমাজ সংস্কারের মূলতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সমাজ একটী প্রাসাদ স্বরূপ—আপন ভিত্তিতে উহা স্থির অটল। উহার আকার চিরদিনের জন্য ঠিক হইয়া গিয়াছে—আর্য্য ঋষিগণ যে আকার দান করিয়া গিয়াছেন।

ইহাই যদি সমাজের প্রকৃত তত্ত্ব হয় তবে অবশ্যই ইহাতে "অভিব্যক্তির" কোন অবসরই থাকে না—কারণ অভিব্যক্তি কেবল জীবন্ত জিনিষ সম্বন্ধেই সম্ভবপর। পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাহা আপনার পূর্ণতাকে লাভ করে তাহার সম্বন্ধেই Evolution খাটে। তাজমহল নির্ম্মাণ এক অংশের পর আর এক অংশের যোগ—ইহা অভিব্যক্তি নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন একটী বট বৃক্ষ। যখন

বীজ, যখন অঙ্কুর, যখন ক্ষুদ্র কাণ্ড, যখন শাখা প্রশাখায় বিশাল—এই সকল অবস্থাতেই সে সেই একই বট বৃক্ষ, একটী অখণ্ড তরুজীবনেরই ধারাবাহিক ইতিহাস এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন পরম্পরা। এই সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সে বট বৃক্ষের আদর্শকেই পূর্ণতররূপে লাভ করিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহার শাখা ভগ্ন হইয়াছে, তাহার পত্র ঝরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে তাহার অন্তনিহিত জীবনী শক্তির বলে এই রিক্ত দৈন্যকে দূরে সরাইয়া আপনার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যকে লাভ করিয়াছে। এইখানেই ক্রমবিকাশ। ভূদেব বাবুর মতে প্রাচ্য আদর্শে ক্রমবিকাশ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে সমাজ জীবন্ত বস্তু—সুতরাং পরিবর্ত্তন—সুতরাং পরিণতি, বিকাশ। আজকাল আমরা Reform, Reconstruction—সংস্কার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা ঠিক হয় না—যথার্থ কথা উন্নতি, বিকাশ—আপনাকে পূর্ণতররূপে লাভ করা—Self-realisation. বর্ত্তমানে Sociologist সম্প্রদায় যে বলিতেছেন যে সমাজে দীন দুঃখীকে স্থান দিতে হইবে এটা Reform নহে। ঈশার ভিতরে যে ভাব নিহিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, এখন অভিব্যক্তির নিয়মে উহা এই আকার গ্রহণ করিতেছে।

ভূদেব বাবুর মতাবলম্বীগণ হিন্দু সমাজে Evolution স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমি বলি এখানেও ক্রমবিকাশ আছে। "আছে" বলিতে গেলে ইহার সঙ্গে আর দুইটী কথা বলিতে হয়। (১) এখন ইহার গতি এত মৃদু যে "নাই" বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা প্রাচীনকালে এ বিকাশ-ক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইয়াছে—সহসা মধ্যপথে "থমকিয়া" গিয়াছে। এক সময়ে হিন্দু আদর্শ বিকাশের প্রণালীতে সুন্দর মূর্ত্তি লাভ করিয়া যেন থামিয়া গিয়াছে। (২) সুতরাং ইহার বিকাশ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে অতীতে

গমন করিতে হইবে—সে সুন্দর মূর্ত্তির অন্বেষণে। কালের উজান বাহিয়া সেই স্থলে উপনীত হইতে হইবে যেখান পর্য্যন্ত স্রোত প্রবাহিত হইয়া সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্রোত একেবারে বন্ধ হয় নাই কারণ তাহা হইলে মৃত্যু হইত। তবে গতি অতি মৃদু; তেজ উদ্যম কিছুই নাই। সে মূর্ত্তিতেও উহা নূতন সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রাণের মুক্ত প্রবাহের সৌন্দর্য্য নহে—উহা নিশ্চলতার গাম্ভীর্য্য, উহা Niagaraর শীতের মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য। কিন্তু Niagaraর এই জমাট মূর্ত্তির ভিতরেও প্রাণের ফল ও ধারা প্রচ্ছন্ন আছে—Niagara শীতে জমে, কিন্তু গ্রীষ্মের রবিকিরণ স্পর্শে উহা আবার তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া চলে।

অতীতে যাইতে হইবে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোন্ তারিখে তাহা বলা কঠিন—কারণ এদেশের অতীতে, ইতিহাসের আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ। ঠিক কোন্ সময়ে হিন্দু আদর্শ চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে সে কথা বলা দুষ্কর। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা সাধারণ ভাবে বলিতে পারি এক সময়ের সুন্দর মূর্ত্তি সকলের মানসপটেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভায় জাগিয়া উঠে। যখন তপোবন, যখন আশ্রম, যখন শান্তি, যখন বেদ অধ্যয়ন-শাস্ত্র আলোচনা, উপদেশ। এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল চিত্র রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, কালিদাসে। ভারতে যখন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর ন্যায় মহিমাময়ী নারীকুলের অভ্যুদয়—যখন নৃপতিবৃন্দের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য প্রজাপালন ও তপস্যার বিঘ্ন নিবারণ—এ সেই যুগের ছবি। এই সমুজ্জ্বল সুন্দর চিত্র যে দিন হিন্দু সমাজ দেখাইয়াছে সে দিন ভারতের পুণ্যদিন, ভারতের তাহা মহোচ্চ সৌভাগ্যের দিন। কিন্তু এই সুন্দর ছবির সঙ্গে যখন সমাজের পরবর্ত্তী ম্লান চিত্রের কথা ভাবি তখন মনে বারম্বার এই প্রশ্নই উত্থিত হয় কোন্ দুরন্ত শীত তটিনীর এই লীলা-বিলাসময়ী স্বচ্ছ জলাধারাকে জমাট করিয়া ফেলিল! কোন্ শক্তি তাহার অপ্রতিহত

অবাধ গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া তাহার সকল উদ্যম সকল তেজ বিলুপ্ত করিয়া দিল!

যখন ভাবা যায় কোন্ দুরন্ত শীত আসিয়া এই প্রবাহমান জলস্রোতকে সহসা জমাট করিয়া ফেলিল, তখন মনে হয় হয়তো রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপ এই শীতল ভাব আনিয়া স্রোতকে জমাট করিয়া দিল। কথাটা হয়তো বা সত্যই হইবে, কারণ এ স্বাধীনতা তুচ্ছ বস্তু নহে, পাশ্চাত্য জগতে ইহাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া বলা হইয়াছে (যথা Aristotle)। য়িহুদি জাতির দৃষ্টান্ত লইলে ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের জাতীয় জীবনে আদর্শ অতি সুন্দর ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু সে বিকাশ প্রতিরুদ্ধ হইল, উন্নতি থামিয়া গেল যে সময়ে য়িহুদিগণ ঈশার মঙ্গল আদর্শকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অত্যুগ্র একদেশদর্শিতার বশবর্ত্তী হইয়া মুশার ধর্ম্মেই সন্তুষ্ট ও স্থির হইয়া থাকিলেন।

তবে আমাদের সহিত য়িহুদিদিগের এবিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপে য়িহুদিগণ আবাস শূন্য হইয়া জগতের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। সংখ্যাতেও তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক অল্প। এতদ্ব্যতীত আর একটী কথা—তাঁহাদের মধ্যে জাতি-বিভাগ নাই, সেইজন্য শিক্ষা, দীক্ষা, সাধন সমস্ত জাতিতে একরূপ থাকিল। আমাদের মধ্যে জাতি-ভেদের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক—এখানে শূদ্রগণ সম্পূর্ণরূপে অধিকার শূন্য। যদিও গৃহবিচ্যুত য়িহুদি জাতিকে সকল দেশই নির্য্যাতন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যেও আপনাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন।

আমাদেরও সম্বন্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপের প্রভাব খাটিতে পারে। মুসলমান রাজত্বে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় পাশ্চাত্য জগতের জাতিদিগের

মধ্যেও যে না হইয়াছে তাহা নহে, তবে আমাদের এ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে গভীর অর্থ আছে। ইংল্যাণ্ডে কিছুদিনের মধ্যে নরম্যান ও স্যাক্সন্ জাতিদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন, এখানে কিন্তু হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হইয়া এক জাতিতে পরিণত হইতে পারেন নাই। যদি এরূপভাবে মিলিতে পারিতেন তাহা হইলে এদেশের মঙ্গল হইত।

সে যাহাই হউক হিন্দুধর্ম্মের কিন্তু এক অলৌকিক শক্তি আছে। সে শক্তি এই—ইহা বিদেশীয় আক্রমণের ঘাত প্রতিঘাতে আপনাকে চিরদিন স্থির ও অটল রাখিয়া আসিয়াছে। ভূদেব বাবুর মত গ্রহণ করিয়া যদি এ সমাজকে অট্টালিকা স্বরূপ মনে করা হয়, তবে বলিতে হইবে যে এ অট্টালিকা হিমালয়ের ন্যায় অটল, অচল—কেহই ইহাকে ভেদ করিতে পারে নাই—এখনও ইহাকে বিচলিত করা সুকঠিন। সমুন্নত ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা ও বিজ্ঞানের প্রবল সংঘাতের মধ্যেও হিন্দু সমাজ "হিন্দু" হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! এখানকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর্শ, সন্তোষ ও শান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এ অদ্ভুত রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা সমস্যাজনক। আমরা বলিতে পারি যে শূদ্র এখানে সর্ব্ব অধিকার হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত, কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে শূদ্র আপনার নিয়তিতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। এ সন্তোষ কিরূপে সম্ভবপর? তাহা হইলেই এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে হিন্দুধর্ম্ম শূদ্রজাতিকে আত্মার গভীরতম প্রদেশে নিশ্চয় এমন একটা কিছু দিয়াছে যাহাতে তাহারা সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়াও সন্তোষ ধনে বঞ্চিত হয় নাই। সেই জন্যই ইউরোপীয়গণ এদেশ দেখিয়া অবাক হইয়া যান। এত দারিদ্র্য, এত অধিকার বৈষম্য, কিন্তু তথাপি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একি গভীর শান্তি! সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের যে একটা অতি অলৌকিক শক্তি আছে একথা স্বীকার করিতেই হয়।

কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে হিন্দুর জাতীয় জীবনস্রোত জমাট বাঁধিয়াছে। আর স্রোত রুদ্ধ হইলেই আবিলতা ও আবর্জ্জনা অবশ্যম্ভাবী। এইবার আপনারা ভাবিয়া বলুন—আমাদের আদর্শ কি হইবে? আমরা ভুদেব বাবুকে মানিয়া লইব অথবা অন্যপ্রকার ভাবিব? আমরা কি স্বীকার করিব যে সমাজ নির্জ্জীব অট্টালিকা স্বরূপ—অথবা বলিব যে সমাজ জীবন্ত বস্তু যাহা পরিবর্ত্তনকে ভয় করে না? শুধু ভয় করে না তাহা নহে, প্রত্যুত পরিবর্ত্তনই ইহার নিয়ম, তাহার ভিতর দিয়াই সে আপনাকে পূর্ণতররূপে লাভ করিয়া থাকে। শুধু সংস্কার নহে—কিন্তু পরিবর্ত্তন—বিকাশ—উন্নতি—আপনাকে লাভ করা। যেমন বৃক্ষের শাখা ভগ্ন হয়, পত্র বিশুষ্ক হয়, পুষ্প ঝরিয়া পড়ে—কিন্তু আবার বসন্তের মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র উচ্চারিত হইলেই তরু আপনার রিক্ততার মধ্যে পরিপূর্ণতার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া নবসুষমায় বিকশিত হইয়া উঠে, তেম্নি উন্নতির স্রোতে ছাড়িয়া দাও জীবনকে, সে সহস্র বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে অবিরাম অগ্রসর হইয়া চলিবে এবং এইরূপে তাহার নিজের আকার, বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। ইহা একটী কড়ি বদলান নহে—ইহা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনাকে পূর্ণতর রূপে লাভ করা।

এখন কোন্‌টীকে গ্রহণ করিব? জীবন্ত স্রোতের মধ্যে পড়িলে নূতন জীবনী শক্তি লাভ করিব—যদি এই আদর্শ গ্রহণ করি তাহা হইলে আমরা পরিবর্ত্তনকে ভয় করিব না। যাঁহারা ভুদেব বাবুর মতাবলম্বী তাঁহারা বলিয়া থাকেন, দেখ, সভ্যতাভিমানী গ্রীস, বিশ্বের রাণী রোম, আজ কোথায়, কোন্ মৃত্যুর অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতের হিন্দু সমাজ এখনও বর্ত্তমান! যদি আপনার প্রাথমিক আকারটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকাই থাকা হয়, তবে তাঁহাদের এ কথা সম্পূর্ণ সত্য! বাস্তবিক ইংরাজ বা মহম্মদীয় প্রভাবে হিন্দুসমাজের

কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু সত্য সত্যই কি গ্রীস, রোম মরিয়াছে? পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শের মধ্যে যে গ্রীস, রোম বাঁচিয়া রহিয়াছে—তাহাদের মৃত্যু নাই। এ আদর্শে Hellenism, Roman Empire, Barbarians—তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন। Themistocles আর ইহজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম আত্মা পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুপ্রাণিত করিয়া এখনও বর্ত্তমান।

ভারতে যদি হিন্দু মুসলমান মিলিয়া যাইতে পারিত তবে হিন্দু সমাজের গতি থাকিত—উহার তেজ অক্ষুণ্ণ থাকিত। এখনও যদি আমরা মিশিতে পারি, যদি উভয়ের সম্মিলনে একটী সমাজ, একটী জাতি গঠিত হয়—তবে সামাজিক বিকাশের স্রোত থাকিবে, গতি থাকিবে। কেহ ভয় করিতে পারেন যে এরূপ সম্মিলনে হিন্দুর বিশেষ ভাব বিনষ্ট হইবে, মুসলমানেরও বিশেষ ভাব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে ভয় নাই—কোন সমাজই নিজের বিশেষত্ব হারাইবে না—অথচ উদার মিলন-তীর্থে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হইবে। এরূপ না হইলে হিন্দু সমাজের সেই ঘাতসহ অলৌকিক শক্তির উপর বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে সুকঠোর আঘাত আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সে আর দীর্ঘকাল স্থির থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। তাহার অটল, দুর্ভেদ্য দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে মনে হইতেছে। কিন্তু যদি এই সঙ্কীর্ণ সঙ্কোচ ভাব পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ চতুর্দ্দিকের শক্তির সংঘাতকে লাভ করে, উহাকে আপনার করিয়া লয়, স্রোতের সঙ্গে স্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া চলে, তবে নিশ্চয়ই নব অভ্যুদয় আসিবে। পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তন পরস্পরকে আপনার বিকাশের উপযোগী ও অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে নব নব শক্তিতে নবজীবন লাভ হইবে।

আজ প্রাচ্য আদর্শের ক্রম বিকাশের অর্থ বলা হইল মাত্র; মূল বিষয়ের আলোচনা বিশেষ কিছুই করা হইল না; এখন আমি প্রতীচ্য অভিব্যক্তির মূল নীতির সহিত প্রাচ্য ক্রমবিকাশ নীতির কিঞ্চিৎ তুলনা করিয়া অদ্যকার আলোচনা উপসংহার করিব।

(১) প্রতীচ্য আদর্শে সয়তান, প্রাচ্য আদর্শে মায়া। পাশ্চাত্য জগৎ ইচ্ছাশক্তিকে বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছে। ঈশ্বর স্রষ্টা, সৃষ্টি ইচ্ছা সম্ভূত। মানুষের জীবনের মূলে এই ইচ্ছাশক্তি। প্রতীচ্য আদর্শে ইচ্ছা শক্তির মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে প্রকীর্ত্তিত। ধর্ম্ম সমাজ সকলই এই ইচ্ছা হইতে সমুদ্ভুত। প্রাচ্য মায়াবাদের কথা পূর্ব্বেই কিছু আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু আদর্শে কর্ম্মবাদ বা প্রাক্তনবাদ; এই কর্ম্মবাদে নৈতিক দায়িত্বের ভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রাক্তনবাদের মূলতত্ত্ব ইহা নহে। উহা ঠিক প্রতীচ্য আদর্শের বিপরীত, কারণ কর্ম্মকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। শঙ্কর সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরের একদেশদর্শিতা (বৈষম্যনীতি) আছে কিনা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উত্তরে বলিয়াছেন—না, ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি করেন নাই—তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সুকৃত বা দুষ্কৃতের ফলে সংসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট জন্ম লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেহ যদি এখানে প্রশ্ন করেন—যে আদিতে কিরূপে হইল এই সুকৃত ও দুষ্কৃতের পার্থক্য? প্রথম কিরূপে আম তেঁতুল, সুন্দর অসুন্দর, ক্ষুদ্র বৃহৎ, এই সকল বৈষম্য উপস্থিত হইল—তখন তো আর কর্ম্মবিভাগ ছিল না। ইহার উত্তর এই—না, তাহা নহে, এই কর্ম্ম অনাদি, কখনও ছিল না এরূপ নহে। এরূপ হইলে নৈতিক দায়িত্ববোধ কিরূপে থাকিতে পারে বুঝিতে পারা যায় না। এখানে ইচ্ছা শক্তির গুরুত্ব কিছুমাত্র স্বীকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য আদর্শের ইচ্ছাশক্তিবাদের ঠিক বিপরীত এই প্রাচ্য প্রাক্তনবাদ! এতদুভয়ের

বিভিন্ন প্রভাবে দুই সমাজও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

(২) পাশ্চাত্য জগতে Stateএর সহিত Churchএর বিরোধ ও সংঘর্ষ। Charlemagn Empire বনাম Roman Catholic Church। State বলিতেছেন আমারই প্রভুত্ব, আমারই গৌরব সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইবে; Church বলিতেছেন আমার বেদীতলে সকল সম্রাটকে মস্তক নত করিতে হইবে। এই বিরোধ—এ বিরোধের মধ্যে মধ্যে সামঞ্জস্যের আলোক দেখা গিয়াছে কিন্তু আবার বিরোধ নব-ভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যেন প্রকৃত সামঞ্জস্যের আলোক পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সে আলোক এই—Stateএর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথাও নাই, জনসাধারণই প্রকৃত State। আবার জনসাধারণকে লইয়াই Church, সুতরাং Peopleই প্রকৃত Church; পার্লামেণ্ট, State নহেন। পোপও Church নহেন, জনসাধারণই State এবং Church। যদিও এখনও এ বিরোধের পূর্ণ শান্তি হয় নাই, কিন্তু শীঘ্রই বিরোধ মিটিবে এখন সে আশা হয়।

প্রাচ্য জগতে এরূপ কোন সংঘর্ষ কস্মিনকালেও হয় নাই। এখানে ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব চিরদিনই অবনত মস্তকে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এবিষয়ে ব্যতিক্রম কেবল বুদ্ধদেব। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের ফল কি কি দাঁড়াইয়াছে? সমাজের গতি থামিয়া গিয়াছে। তদানীন্তন কালের সমাজের পক্ষে হয়তো এটী অতি সুন্দর ব্যবস্থাই ছিল, কারণ তখন শূদ্র প্রকৃতই অত্যন্ত হীন ছিল, এবং ব্রাহ্মণ সর্ব্ববিষয়ে সকলেরই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সেইজন্য সে সময় অপার সন্তোষ এবং অসন্দিগ্ধ সুখের রাজত্ব ছিল। কিন্তু কালে সামাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত যখন প্রাচীন বিধির কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সাধিত হইল না, তখন উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়িল।

বর্ত্তমান যুগে রাজা রামমোহন এই নিশ্চেষ্ট শান্তিতে বিরোধের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

(৩) পাশ্চাত্য জগতে জড়ের সহিত আত্মার বিরোধ—Temporal বনাম Spiritual। Monasticism সংসারকে একেবারে বাদ দিয়া বসিলেন, Secularism শারীর সুখকেই জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখ করিয়া লইল। কিন্তু এখন এ ক্ষেত্রেও মীমাংসার আলোক দেখা গিয়াছে। ভগবান শুধু স্বর্গরাজ্যের—Kingdom of Heavenএর দেবতা নহেন—তিনি কেবল Millennium বা সত্য যুগের বিধাতা নহেন, তিনি এই মরজগতেরও দেবতা। তিনি নৈতিক নিয়মের নিয়ন্তা, "মহান্ প্রভুর্বৈপুরুষঃ প্রধানঃ।"

(৪) পশ্চিমে সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির বিরোধ—Socialism বনাম Individualism; Society সেখানে রাজা; পুরোহিত এবং আভিজাত বংশীয়গণ সেখানে অন্যান্য যাবতীয় লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে ব্যাকুল। সকল বিষয়ই আইনের বিধি ব্যবস্থা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া যাইতেছে, শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিকের হার পর্য্যন্ত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, কালে কালে এই আভিজাত একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রজা সাধারণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, Individual আপনার স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু এখানেও এখন সামঞ্জস্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখন Society জনসাধারণ। এই Society সামাজিক নিয়ম শাসন বিধিবদ্ধ করিবেন। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের অধিকার পূর্ণমাত্রায় অক্ষুন্ন থাকিবে অথচ ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরোধের সামঞ্জস্য হইয়া যাইবে।

(৫) পশ্চিমে অতিপ্রাকৃত ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ। এক সময়ে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভগবান অতিপ্রাকৃত ঘটনার মধ্য

দিয়া পাপীকে উদ্ধার করিবেন। এক সময় আবার জড়বিজ্ঞান মস্তক উত্তোলন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়াইতে চেষ্টা করিল। এখন বর্ত্তমান যুগে কিন্তু বিজ্ঞান বলিতেছেন বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণু ব্যাপিয়া সেই ভগবানের চিৎশক্তির লীলা। কেশবচন্দ্রও পূর্ণমাত্রায় Positivist ছিলেন। তিনি বারম্বার বলিয়াছেন আমরা বিজ্ঞানকে ভয় করিব না বরং বিজ্ঞানকে পূর্ণমাত্রায় মানিয়া চলিব। এখন মনে হইতেছে এই বিজ্ঞানই আপনার নূতন আলোকে পূর্ব্বোক্ত বিরোধের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দিবে।

পূর্ব্বজগতে, অর্থাৎ ভারতে এ সকল বিরোধের ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু এখানেও বিরোধ চলিয়াছে—সে বিরোধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ। পূর্ব্ব মীমাংসা বনাম উত্তর মীমাংসা। জৈমিনির কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ব্যাসের জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ। ভারতে জ্ঞান আপনার প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল করিয়া লইল; কিন্তু কালে উহা আপনার অধিকার-ভূমি অতিক্রম করিয়া ফেলিল। ইহার ফলে ভারতে আবার নূতন বিরোধের সূত্রপাত হইল—সে বিরোধ জ্ঞানের সহিত ভক্তির বিরোধ। শঙ্কর বনাম শ্রীগৌরাঙ্গ। এই বিরোধের তুমুল আবর্ত্তের মধ্যে আবার মিলনের মঙ্গল-ভূমি পরিলক্ষিত হইতেছে; গীতার মধ্যে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম যোগের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে এরূপ হইয়াছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আমি সমাজকে অট্টালিকা মনে করি না—কিন্তু আমি উহাকে সজীব বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি বিশ্বাস করি যে অন্যান্য যাবতীয় সজীব বস্তুর ন্যায় সমাজেরও ক্রমবিকাশ বা Evolution আছে। হিন্দু-আদর্শ এই অভিব্যক্তির নিয়মে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে হইতে গীতায় আসিয়া যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে—হিন্দু-আদর্শকে এখন সেই অবস্থায় দেখিতে হইবে।

আর পাশ্চাত্য জগতেও আদর্শ বিকশিত হইয়া এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে—সে আদর্শকে সেই ভূমিতেই দর্শন করিতে হইবে। এই দুই আদর্শকে এই অবস্থায় পাশাপাশি দাঁড় করাইলে বোধ হয় ইহারা পরস্পরকে চিনিতে সমর্থ হইবে—এ দুই আদর্শে এখন মিলন সম্ভবপর। শুধু সম্ভবপর নহে কিন্তু এতদুভয়ের এই শুভ-সম্মিলনেই নব যুগের নূতন বিধান। এই মিলনকে যদি আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত অকপট শ্রদ্ধার সহিত, পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের নিয়তি সাফল্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।